ইসলাম

সন্ত্রাস না

আদর্শ

?

স্বামী লক্ষ্মী শংকরাচার্য

প্রকাশক ঃ বাংলা ইসলামী প্রকাশনী ট্রাষ্ট
২৭বি লেনিন সরণী
কলকাতা-৭০০ ০১৩
ফোন: ০৩৩ ২২৪৯ ০৯৮৭

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট, ২০১৪
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারি, ২০১৫

বিনিময় ঃ ৩০ টাকা

মুদ্রণে ঃ সিলভার প্রিন্ট
কলকাতা-৭০০ ০১৩

Islam: Santras Noy Adarsha
Written by Swami Laxmi Shankaracharya
Published by Bangla Islami Prakashani Trust
27B, Lenin Sarani, Kol-13
Printed by Silver Print, Kolkata-700 013
Price Rs. : 30/-

বিষয় সূচি

বিষয়		*পৃষ্ঠা*
কয়েকটি ইসলামী পারিভাষিক শব্দ	...	৫
যখন আমি সত্যকে জানলাম	...	৭
একটি পরিকল্পিত অভিসন্ধিমূলক চক্রান্ত	...	৯
হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী	...	১১
ইসলাম এবং সন্ত্রাস	...	২২
কুরআনের ২৪টি আয়াত	...	২৮
কুরআনের আদর্শ	...	৫০
মানবতার কল্যাণের জন্য শ্রেষ্ঠ সদাচার ইসলামে রয়েছে	...	৫৭
ইসলামে নিহিত আদর্শ ন্যায় ও সুবিচার	...	৫৯
ইসলাম বিশ্বের সর্বোচ্চ ব্যবহারিক মানবীয় আদর্শ	...	৬২
পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.)-এর বাণী	...	৬৫
সনাতন বৈদিক ধর্ম এবং ইসলাম	...	৬৮
সনাতন বৈদিক ধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে আশ্চর্যজনক সাজুয্যতা	...	৭০
একটু ভেবে দেখুন !	...	৭৯
আমাদের সকলের কর্তব্য	...	৮৩
সমর্পণ	...	৮৫

কয়েকটি ইসলামী পারিভাষিক শব্দ

ঈমান ঃ

বিশ্বাস, আস্থা, মেনে নেওয়া। প্রকৃতপক্ষে স্বীকৃতি দান করা এবং মেনে নেওয়াকে ঈমান বলা হয়। এর বিপরীত শব্দ হ'ল-অস্বীকার করা, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, কুফর ইত্যাদী। ইসলামের শিক্ষা যা ঈশ্বরের কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা মেনে নেওয়া এবং আন্তরিকতার সাথে স্বীকার করার নাম ঈমান।

আহলে কিতাব (কিতাব ওয়ালা বা কিতাবধারী) ঃ

সেইসব লোক যাদের প্রতি ঈশ্বরের পক্ষ থেকে কিতাব (গ্রন্থ) প্রদান করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের প্রতি যথাক্রমে তাওরাত এবং ইন্‌জিল কিতাব প্রদান করা হয়েছিল।

কাফির ঃ

কুফরীকারী, অস্বীকারকারী, সত্যকে গোপনকারী, অকৃতজ্ঞ। সেইসব লোক যারা ঐ সমস্ত সত্যতাকে মেনে নিতে এবং স্বীকার করতে অস্বীকার করে যে শিক্ষা ঈশ্বরের পয়গম্বর (বার্তাবাহক) দিয়েছেন। ব্যাকরণের দৃষ্টিতে 'কাফির' একটি গুনবাচক সংজ্ঞা, কোন অপমান বোধক শব্দ নয়। কুরআনে যেখানেই তাঁর শিক্ষাবলী ও আদেশসমূহকে অস্বীকারকারীদের জন্য 'কাফির' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য গালি দেওয়া, ঘৃণা এবং হেয় প্রতিপন্ন করা নয়, বরং তাঁকে অস্বীকার করার কারণ বাস্তবিকভাবে প্রকট করার জন্য এইভাবে বলা হয়েছে। 'কাফির' শব্দ হিন্দু-র সমার্থক শব্দও নয় যেমন অপপ্রচার করা হয়ে থাকে। 'কাফির'-এর প্রায় সমার্থক শব্দ হ'ল 'নাস্তিক'। ইসলামের দৃষ্টিতে নিছক এই অস্বীকার করার কারণেই কোন ব্যক্তিকে এই দুনিয়ায় না কোন শাস্তি দেওয়া যেতে পারে, আর না কোন মানবীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে। ঐ ব্যক্তি পার্থিব বিষয়ে সমানাধিকার পাবে।

প্রত্যেক ধর্মে সেই ধর্মের মৌলিক ধারণা, বিশ্বাস ও শিক্ষাবলীকে মান্যকারী এবং অমান্যকারীদের জন্য পৃথক পৃথক শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন হিন্দু ধর্মে সেইসব লোকদের উদ্দেশ্যে নাস্তিক, অনার্য, অসভ্য, দস্যু এবং ম্লেচ্ছ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে যারা হিন্দু ধর্মের অনুসারী নয়।

রসূল, নবী ঃ

পয়গম্বর (বার্তাবাহক), দূত, সেই ব্যক্তি যিনি বার্তা বহন করার পদে নিযুক্ত। সেই ব্যক্তি যার দ্বারা পরমেশ্বর মানুষদেরকে তাঁর নিজের পথ দেখান এবং লোকদের কাছে তাঁর সুসংবাদ পৌঁছে দেন।

জিহাদ ঃ

প্রাণান্ত চেষ্টা, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পূর্ণশক্তি নিয়োগ করা। যুদ্ধের জন্য কুরআনে 'কিতাল' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। জিহাদের অর্থ কিতালের অর্থের তুলনায় অনেক বেশি বিস্তৃত। কোন ব্যক্তি সত্যের জন্য যদি নিজের ধন সম্পদ, লেখনী ও কথায় অধ্যাবসায়ী হয় এবং এরই জন্য নিজেকে নিয়োগ করে থাকে তাহলে সে জিহাদই করছে। সত্যের জন্য যুদ্ধও করতে হতে পারে এবং এজন্য প্রাণ উৎসর্গ করতেও হতে পারে। এটাও জিহাদের একটা অঙ্গ। জিহাদকে তখনই ইসলামী জিহাদ বলা যাবে যখন তা ঈশ্বরের জন্য এবং ঈশ্বরের নির্দেশ অনুয়ায়ী হবে, ধন দৌলত প্রাপ্তির জন্য নয়।

যখন আমি সত্যকে জানলাম

কয়েক বৎসর পূর্বে আমি দৈনিক জাগরনে শ্রী বলরাজ মাধকের ''দাঙ্গা কেন হয়'' শিরোনামে একটি লেখা পড়েছিলাম। এই প্রবন্ধে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হওয়ার কারণ রূপে কুরআন মজীদে কাফিরদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ'কে পেশ করা হয়েছে। প্রবন্ধে কুরআন মজীদের সেইসব আয়াতগুলিও দেয়া হয়েছে।

এরপর কোন এক ব্যক্তি দিল্লী থেকে প্রকাশিত 'কুরআনের চল্লিশ আয়াত, যেগুলি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বিবাদ করার আদেশ দেয়' শিরোনামে একটি পুস্তিকা আমাকে দিল। এটা পড়ার পর আমার মনে ইচ্ছা জাগলো যে, আমি কুরআন পড়ব। ইসলামী বইয়ের দোকান থেকে আমি কুরআনের হিন্দী অনুবাদ পেলাম। কুরআন মজীদের ঐ অনুবাদ থেকে আমি উক্ত সবই আয়াত পেয়ে গেলাম যেগুলি পুস্তিকাতে লেখা হয়েছিল। এর মাধ্যমে আমার মনে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হ'ল যে, ইতিহাসে হিন্দু রাজাদের ও মুসলিম বাদশাদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ এবং বর্তমানে সংঘটিত দাঙ্গা ও সন্ত্রাসবাদের কারণ ইসলাম। মস্তিষ্কে বিভ্রান্তি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এজন্য প্রতিটি সন্ত্রাসবাদী ঘটনায় আমি ইসলামের যোগসাজশ দেখতে শুরু করলাম।

ইসলাম, ইতিহাস এবং বর্তমান ঘটনাবলীকে জুড়ে নিয়ে আমি একটি বই লিখে ফেললাম- 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস' যার ইংরেজী অনুবাদ 'The History of Islamic Terrorism' নামে সুদর্শন প্রকাশন, সীতাকুঞ্জ, লিবার্টী গার্ডেন, রোড নম্বর-৩, মালাড (পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত হয়।

সম্প্রতি আমি ইসলাম ধর্মের ওলামাদের (বিদ্বান ব্যক্তিগণের) বিবৃতি পড়ে জেনেছি যে, ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোন সম্পর্ক নেই। প্রেম, সদ্‌ভাবনা এবং ভ্রাতৃত্বের ধর্ম হ'ল ইসলাম। কোন নিরপরাধকে হত্যা করা ইসলাম ধর্ম বিরোধী। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ফতোয়াও (ধর্মাদেশ) জারি হয়েছে।

এরপর আমি কুরআন মজীদে উল্লেখিত জিহাদ সম্পর্কিত আয়াতগুলি প্রসঙ্গে জানার জন্য মুসলিম বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলাম। তাঁরা আমাকে বললেন- কুরআন মজীদের আয়াতগুলি তৎকালীন ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। এজন্য কেবল কুরআন মজীদের অনুবাদ মাত্র না দেখে বরং সেইসঙ্গে এটাও দেখা জরুরী যে, কোন্ আয়াত কি পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তাহলেই তার সঠিক অর্থ ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা যাবে।

এই সঙ্গে এটাও প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআন ইসলামের পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.)[১] এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। অতএব কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবন করার জন্য পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.) এর জীবনীর সঙ্গে পরিচিত হওয়াও জরুরী।

বিদ্বজ্জনেরা আমাকে বললেন- "আপনি কুরআনের যে সব আয়াতগুলির হিন্দী অনুবাদ আপনার বইতে লিখেছেন, সে সব আয়াতগুলি অত্যাচারী কাফির এবং মুশরিকদের জন্য অবতীর্ন করা হয়েছে যারা আল্লাহর রসূলের (স.) সঙ্গে লড়াই করত এবং দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য তৎপরতা চালাতো। সত্য ধর্মের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী ঐসব লোকদের বিরুদ্ধে কুরআনে জিহাদের নির্দেশ রয়েছে।"

তাঁরা আমাকে বললেন যে, 'ইসলাম সম্পর্কে সঠিকভাবে জ্ঞাত না হওয়ার কারণে লোকেরা কুরআন মজীদের পবিত্র আয়াতগুলির মর্ম অনুধাবন করতে পারে না। যদি আপনি সম্পূর্ণ কুরআন মজীদের সঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর জীবনীও পড়তেন তাহলে আপনি বিভ্রান্ত হতেন না।'

মুসলিম পন্ডিতদের পরামর্শ অনুসারে আমি সর্বপ্রথম পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর জীবনী পড়লাম।[২] জীবনী পড়ার পর এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যখন মনের শুদ্ধতাসহ কুরআন মজীদ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়লাম, তখন কুরআন মজীদের আয়াতগুলির সঠিক মর্ম ও তাৎপর্য আমার উপলব্ধিতে আসতে শুরু করল।

সত্য সামনে প্রকট হওয়ার পর আমি আমার ভুল বুঝতে পারলাম যে, আমি অজ্ঞানতাবশতঃ বিভ্রান্ত হয়েছিলাম আর এই কারণেই আমি উক্ত বই 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস'-এ ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদকে যুক্ত করেছিলাম। এজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

আমি আল্লাহর কাছে, পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.)-এর কাছে এবং সমস্ত মুসলিম ভাইদের কাছে সার্বিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী। অজ্ঞানতাবশতঃ আমার লিখিত ও ব্যক্ত কথাগুলি আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। জনগণের আছে আমার নিবেদন এই যে 'ইসলামী সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস' গ্রন্থে যা কিছু লিখেছি সে সবকে শূন্য (কিছুই নয়) মনে করবেন।

---

১. (স.)-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ হ'ল 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' যার অর্থ- 'আল্লাহ তাঁর উপর শান্তি বর্ষণ করুন। হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর নাম যখন লেখা, বলা অথবা শোনা হয় তখন দোয়ার এই শব্দ তাঁর প্রতি সম্মান ও ভালবাসা বৃদ্ধি করে দেয়।

২. 'জীবনী হযরত মুহাম্মাদ'-লেখক মুহাম্মাদ ইনায়াতুল্লাহ সুবহানী। অনুবাদক- নাসীম গাযী ফালাহী। প্রকাশক- মারকাযী মকতবা ইসলামী পাবলিশার্স, আবুল ফযল এনক্লেভ, জামিয়া নগর, নতুন দিল্লী-২৫

একটি পরিকল্পিত অভিসন্ধিমূলক চক্রান্ত

শুরু কিছুটা এভাবে হয়েছে যে, ভারত সহ পৃথিবীর কোথাও যদি কোন বিস্ফোরণ হয় অথবা কোন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় এবং ঐ ঘটনায় কোন মুসলমান যদি যুক্ত থাকে তাহলে সেটাকে ইসলামী আতঙ্কবাদ বলা হচ্ছে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংবাদ মাধ্যমসহ কিছু শক্তি (গোষ্ঠী) নিজ নিজ স্বার্থে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে এটাকে ইসলামী সন্ত্রাসবাদ এই পরিভাষায় রূপান্তরিত করে দিয়েছে। অভিসন্ধিমূলক উক্ত চক্রান্তের অন্তর্গত অপপ্রচারের পরিণাম এই হয়েছে যে, আজ যেখানেই কোন বিস্ফোরণ হোক না কেন তৎক্ষণাৎ সেটাকে ইসলামী সন্ত্রাসবাদী ঘটনা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়।

এই বাতাবরণে সারা বিশ্বের জনগণের মধ্যে সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে এবং পশ্চিমী দুনিয়া সহ বেশ কিছু পৃথক পৃথক দেশ পৃথক পৃথক ভাষায় শত শত বই-পুস্তক লিখে প্রচার করেছে যে, বিশ্বে আতঙ্কবাদের মূল হ'ল ইসলাম।

এই অপপ্রচারের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে, কুরআনে আল্লাহর বাণীগুলি মুসলমানদের নির্দেশ দেয় যে, তারা যেন অন্য ধর্মাবলম্বী কাফিরদের সঙ্গে লড়াই করে, তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে কিংবা তাদেরকে আতঙ্কিত করে জোরপূর্বক মুসলমান বানায়, তাদের উপাসনালয়গুলিকে ধ্বংস করে। এটা হ'ল জিহাদ, আর জিহাদকারীদেরকে আল্লাহ জান্নাত দান করবে। এইরকম পরিকল্পিতভাবে ইসলামের দুর্নাম করার জন্য ইসলামকে নির্দোষীদের হত্যাকারী, সন্ত্রাসবাদী ধর্ম হিসাবে প্রচার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, জিহাদের উদ্দেশ্য হ'ল সন্ত্রাসবাদ।

সঠিক কথাটি কি ? এটা জানার জন্য আমি ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করব, যে পদ্ধতিতে আমি সত্যকে জেনেছিলাম।

বিশুদ্ধ মন নিয়ে আমার এই পবিত্র প্রয়াসে অজ্ঞাতসারে যদি কোন ভুল হয়ে যায়, তাহলে সেজন্য পাঠকবর্গ যেন আমাকে ক্ষমা করেন।

ইসলাম প্রসঙ্গে যে কোনও কিছু প্রমাণ করার জন্য এখানে আমি তিনটি মানদন্ড গ্রহণ করব ঃ

১. কুরআন মজীদে আল্লাহর আদেশ।

২. পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর জীবনী।

৩. **হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর বাণী অর্থাৎ হাদীস।**

❖ সত্যিই কি ইসলাম নির্দোষীদের সঙ্গে লড়াই করতে এবং তাদেরকে হত্যা করতে অথবা হিংসা ছড়াতে আদেশ দেয়?

❖ সত্যিই কি ইসলাম অন্যদের উপাসনালয়গুলিকে ভাঙার আদেশ দেয়?

❖ সত্যিই কি ইসলাম মানুষদেরকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানোর নির্দেশ দেয়?

❖ সত্যিই কি হামলা করা, নির্দোষীদের হত্যা করা এবং আতঙ্ক ছড়ানোর নাম জিহাদ?

❖ সত্যিই কি ইসলাম একটি সন্ত্রাসবাদী ধর্ম?

সর্বপ্রথম এটা ব্যক্ত করা জরুরী যে, হযরত মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর শেষ পয়গম্বর। আল্লাহ আকাশ থেকে কুরআন মুহাম্মাদ (স.)-এর উপরই অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহর পয়গম্বর হওয়ার পর থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত ২৩ বৎসর যাবৎ তিনি (স.) যা কিছু করেছেন, তা কুরআন অনুসারেই করেছেন।

অন্য কথায়, হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর জীবনের এই ২৩ বৎসর হ'ল কুরআন অর্থাৎ ইসলামের বাস্তব ব্যবহারিক রূপ। অতঃপর কুরআন তথা ইসলামকে জানার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সহজ পদ্ধতি হ'ল মুহাম্মাদ (স.)-এর জীবনী অধ্যয়ন। স্বয়ং আমার নিজেরও অনুভূতি এটা। পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.)-এর জীবনী এবং কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করে পাঠকবর্গ স্বয়ং নির্ণয় করতে পারেন যে-- ইসলাম সন্ত্রাস, না আদর্শ?

হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.)-এর পবিত্র জীবনী লেখকগণ লিখেছেন- পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.)-এর জন্ম মক্কার কুরাইশ কাবীলার (গোত্রের) সরদার আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহর ঘরে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল। মুহাম্মাদ (স.)-এর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহর মৃত্যু হয়েছিল। মুহাম্মাদ (স.)-এর বয়স যখন ৬ বৎসরে পৌঁছায় তখন মাতা আমিনাও দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। ৮ বৎসর বয়সে পিতামহ (দাদা) আব্দুল মুত্তালিবেরও মৃত্যু হ'ল। তখন থেকে তিনি চাচা আবু তালিবের রক্ষণাবেক্ষণে প্রতিপালিত হতে লাগলেন।

২৫ বৎসর বয়সে মুহাম্মাদ (স.)-এর বিবাহ খাদীজার সঙ্গে হয়েছিল। খাদীজা মক্কার এক সম্পদশালী এবং সম্মানিত পরিবারের বিধবা মহিলা ছিলেন।

ওই সময় মক্কার মানুষরা কাবায় স্থাপিত ৩৬০টি মূর্তির পূজা করত। মক্কায় মূর্তিপূজার প্রচলন সিরিয়া থেকে এসেছিল। ওখানে সর্বপ্রথম যে মূর্তিটি স্থাপন করা হয়েছিল সেটা ছিল 'হুবল' নামে এক দেবতার। এটাকে সিরিয়া থেকে আনা হয়েছিল। এরপর 'ইসাফ' ও 'নায়েলা' নামে মূর্তিদ্বয়কে যমযম কূপের উপর স্থাপিত করা হয়েছিল। এছাড়াও প্রত্যেক কবীলা নিজের নিজের আলাদা আলাদা মূর্তিগুলি স্থাপিত করেছিল। যেমন, কুরাইশ গোত্র 'ওজ্জা', তায়েফের কবীলা সাকীফ গোত্র 'লাত', মদীনার আওস ও খায্‌রাজ গোত্রদ্বয় 'মানাত'-এর মূর্তি স্থাপন করেছিল। এমনিভাবে ওয়াদ্দু, সুওয়া, য়্যাগুস, নসর ইত্যাদী মূর্তিগুলি ছিল। এছাড়াও হযরত ইব্রাহীম, হযরত ইসমাঈল, হযরত ঈসা প্রমুখদের চিত্র ও মূর্তি খানায়ে কাবাতে মওজুদ ছিল।

এই পরিস্থিতিতে ৪০ বৎসর বয়সে মুহাম্মাদ (স.) প্রথমবার রমযান মাসে মক্কা থেকে ৬ মাইল দূরে 'গারে হিরা' (হিরা নামক গুহা)-তে এক ফেরেশতা জিবরাঈল মারফৎ আল্লাহর বার্তা (পয়গাম) প্রাপ্ত হলেন। এরপর আল্লাহর পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (স.) বিভিন্ন সময়ে আল্লাহর আদেশ পেতে থাকলেন।

আল্লাহর এই সমস্ত বার্তাসমূহের সামগ্রিক রূপ 'কুরআন'। মুহাম্মাদ (স.) মানুষদের মধ্যে আল্লাহর পয়গাম পেশ করতে শুরু করলেন। তা হ'ল, ''আল্লাহ (পরমেশ্বর) এক, তাঁর কোন শরীক নেই। কেবল তিনিই উপাসনার যোগ্য। সব মানুষের উচিৎ তাঁরই দাসত্ব (ইবাদত) করা। আল্লাহ আমাকে নবী (পয়গম্বর) বানিয়েছেন। আমার উপর তাঁর বাণী অবতীর্ণ করেন যেন আমি মানুষদের কাছে সত্যকে পেশ করতে পারি, সত্যের সোজা রাস্তা

দেখাতে পারি'' যেসব লোকেরা মুহাম্মাদ (স.)-এর এই বার্তার উপর ঈমান (অর্থাৎ বিশ্বাস) আনল, তারা মুসলিম অর্থাৎ মুসলমান নামে আখ্যায়িত হ'ল। মুসলিম কথার অর্থ হ'ল- আজ্ঞাপালনকারী, অনুগত, নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণকারী।

বিবি খাদিজা (রা.)[৩] পয়গম্বর মুহাম্মাদের উপর ঈমান এনে প্রথম মুসলমান হলেন। এরপর চাচা আবু তালিবের পুত্র আলী (রা.) এবং পালক পুত্র যাইদ (রা.) এবং পয়গম্বর (স.)-এর ঘনিষ্ট বন্ধু আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মুসলমান হওয়ার জন্য ''আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ'' অর্থাৎ ''আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রসূল (বার্তাবাহক)'' --পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

মক্কার অন্যান্য লোকেরাও ঈমান (অর্থাৎ বিশ্বাস) এনে মুসলমান হতে লাগল। কিছুদিন পরেই কুরাইশ সর্দাররা জানতে পারল যে, মুহাম্মাদ (স.) নিজের বাপ-দাদার ধর্ম বহুত্ববাদ (বহু ঈশ্বরবাদ) এবং মূর্তিপূজার পরিবর্তে অন্য কোন নতুন ধর্মের প্রচার করছে এবং বাপ-দাদাদের ধর্মকে শেষ করে দিচ্ছে। এটা অবগত হয়ে মুহাম্মাদ (স.)-এর নিজেরই গোত্র কুরাইশের লোকজনরা খুবই ক্রোধান্বিত হয়ে গেল। মক্কার সমস্ত বহুত্ববাদী কাফির সরদাররা একজোট হয়ে মুহাম্মাদ (স.)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে তাঁর চাচা আবু তালিবের কাছে গেল। আবু তালিব মুহাম্মাদ (স.)-কে ডাকল এবং বলল ''মুহাম্মাদ, এরা সবাই কুরাইশ গোত্রের প্রভাবশালী সরদার। এরা চাইছে তুমি এই প্রচার না কর যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং এরা চাইছে যে, তুমি নিজের বাপ-দাদার ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।''

''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'' (আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) এই সত্যের প্রচার বন্ধ করতে মুহাম্মাদ (স.) অস্বীকার করলেন। কুরাইশ সরদাররা ক্রোধান্বিত হয়ে চলে গেল। এরপর কুরাইশের এইসব সরদাররা সিদ্ধান্ত নিল যে, আমরা মুহাম্মাদের উপর সর্বপ্রকারে পীড়ন ও পেষণ চালাবো। অতঃপর তারা মুহাম্মাদ (স.) এবং তাঁর সাথীদের উপর নির্মমভাবে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার, অপমান করতে এবং তাঁদের উপর পাথর বর্ষণ করতে শুরু করে দিল। তা সত্ত্বেও মুহাম্মাদ (স.) তাদের অত্যাচার এবং দুষ্টামির জবাব সর্বদা কোমলতা, ভদ্রতা ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমেই দিলেন।

মুহাম্মাদ (স.) এবং তাঁর সঙ্গী মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের সহযোগিতা করার

---

৩. (রা.)-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ হ'ল 'রাযি আল্লাহু আনহা'। এর অর্থ হ'ল ''আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোক''। সাহাবী (মহিলা)-দের নামের শেষে এই ভালবাসা ও সম্মান সূচক দো'আ পাঠ করা হয়। পুরুষ সাহাবীদের ক্ষেত্রে 'রাযি আল্লাহু আনহু' পড়তে হয়। সাহাবী সে সমস্ত সৌভাগ্যবান মুসলমানদের বলা হয় যাঁরা মুহাম্মাদ (স.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

জন্য আরবের অন্যান্য আরো বহু কাবীলা (গোত্র) যোগ দিয়েছিল। তারা পরস্পরের মধ্যে এই বোঝাপড়া করে নিল যে, কোন গোত্র কোন মুসলমানকে আশ্রয় দেবে না। প্রত্যেক কাবীলার দায়িত্ব ছিল যে, যেখানেই কোন মুসলমানকে পাওয়া যাবে তাকে খুব মারপিট ও অপমানিত করতে হবে, যাতে তারা তাদের বাপ-দাদাদের ধর্মে ফিরে আসে।

দিনের পর দিন তাদের অত্যাচার বাড়তে লাগল। তারা নির্দোষ, অসহায় মুসলমানদের বন্দী করল, মারধর করল, ক্ষুৎ-পিপাসার মধ্যে রাখল। মক্কার তপ্ত বালুরাশির উপর উলঙ্গ শুইয়ে রাখল, লোহার গরম সলাকার ছ্যাঁকা দিল, নানাভাবে অত্যাচার করল। উদাহরণস্বরূপ, হযরত ইয়াসির (রা.) এবং তাঁর স্ত্রী হযরত সুমাইয়া (রা.) এবং তাঁদের পুত্র হযরত আম্মার (রা.) মক্কার দরিদ্র মানুষ ছিলেন এবং ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁরা মুসলমান হওয়ায় অসন্তুষ্ট মক্কার ইসলাম বিরোধীরা তাঁদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁদের কাপড় খুলে নিয়ে দুপুরের প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে দিত।

হযরত ইয়াসির (রা.) এই অত্যাচার সহ্য করতে গিয়ে তড়পাতে তড়পাতে জীবন দিয়ে দিল। মুহাম্মাদ (স.) ও মুসলমানদের সবচেয়ে বড় বিরোধী আবু জাহল নিতান্ত নির্দয়ভাবে হযরত সুমাইয়া (রা.)-র উপর অত্যাচার করত। একদিন সুমাইয়া আবু জাহলকে বদদোয়া দিল। এতেই অসন্তুষ্ট হয়ে আবু জাহল বর্শার আঘাতে সুমাইয়া (রাঃ)-কে হত্যা করল। এইভাবেই ইসলামে হযরত সুমাইয়া (রা.) সর্বপ্রথম সত্য রক্ষার জন্য শহীদ হলেন।

কুরাইশ লোকেরা হযরত আম্মার (রা.)-কে লোহার কবচ পরিয়ে রৌদ্রে শুইয়ে দিত। উত্তপ্ত রৌদ্রে শুইয়ে দেওয়ার পর মারতে মারতে সংজ্ঞাহীন করে দিত। ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়েছিলেন হযরত বিলাল (রা.)। তিনি কুরাইশ সরদার উমাইয়ার গোলাম ছিলেন। বিলাল মুসলমান হয়ে গেছে একথা জানার পর উমাইয়া বিলালের খানাপিনা বন্ধ করে দিল। ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থাতেই ঠিক দুপুর বেলাতেই তাকে বাড়ির বাইরে পাথরের উপর শুইয়ে দিত এবং বুকের উপর খুব ভারি পাথর চাপা দিয়ে বলত--"নে, মুসলমান হওয়ার মজা দ্যাখ!"

সে সময় যতগুলো গোলাম মুসলমান হয়ে গিয়েছিল তাদের প্রত্যেকেরই উপর এই ধরনের অত্যাচার চালানো হয়েছিল। হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হযরত আবু বকর (রা.) তাদেরকে (মুসলমান গোলামদের) ক্রয় করে করে গোলামী থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। কুরাইশরা যদি কখনও কাউকে কুরআনের আয়াত পড়তে শুনত অথবা নামায পড়তে দেখত তাহলে তখন প্রথমে তাকে দেখে খুব হাসাহাসি করত এবং তারপর তার উপর খুব অত্যাচার করত। এই ভয়ে মুসলমানদের যখন নামায পড়তে হত তখন তারা লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ত। একদিন কুরাইশরা কাবা ঘরে বসেছিল। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) কাবা ঘরের পাশে নামায পড়া শুরু করলেন। তখন সেখানে উপবিষ্ট সমস্ত কুরাইশরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তারা আব্দুল্লাহকে মারতে মারতে কাহিল করে ফেলল।

মক্কার কাফিরদের অত্যাচারের কারণে মুসলমানদের বাঁচা যখন দুষ্কর তখন মুহাম্মাদ (স.) তাঁদেরকে বললেন, "হাবশা (আবিসিনিয়া) চলে যাও।"

হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশি খ্রীষ্টান ছিলেন। আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ পাওয়া মাত্রই অনেক মুসলমান হাবশায় চলে গেল। একথা যখন কুরাইশরা জানতে পারল তখন তারা তাদের দু'জন ব্যক্তিকে দূত বানিয়ে হাবশার বাদশাহর কাছে পাঠিয়ে দিল, তারা বলল-- "আমাদের ওখান থেকে কয়েকজন অপরাধী ব্যক্তি পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছে। তারা আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং আপনার খ্রীষ্টধর্মও স্বীকার করেনি, তা সত্ত্বেও আপনার এখানে রয়েছে। তারা তাদের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে একটা এমন নতুন ধর্ম নিয়ে চলছে, যা সম্পর্কে না আমরা কিছু জানি, আর না আপনিও জানেন। তারা আমাদের কাছে অপরাধী। আমরা তাদের নিতে এসেছি।"

বাদশাহ নাজ্জাশী মুসলমানদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কী এমন নতুন ধর্ম নিয়ে চলছ, যা আমি জানি না?"

তখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত জাফর (রা.) বললেন "হে বাদশাহ! পূর্বে আমরা অসভ্য এবং গোঁয়ার ছিলাম। মূর্তিপূজা করতাম, নোংরা কাজ করতাম, প্রতিবেশীদের সঙ্গে এবং নিজেদের মধ্যে সব সময় ঝগড়াঝাটি করতাম। ইতিমধ্যে আল্লাহ আমাদের মধ্যে একজন রসূল (পয়গম্বর) পাঠালেন। তিনি আমাদেরকে সত্যধর্ম ইসলামের দিকে আহ্বান জানালেন। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দিয়ে বললেন যে, আমরা কেবল এক ঈশ্বরকে পূজা করব, প্রাণহীন মূর্তিপূজা ছেড়ে দেব, সত্য কথা বলব এবং পড়শীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব, কারুর সঙ্গে অত্যাচার ও অন্যায় করব না, ব্যভিচার এবং নোংরা কাজকর্ম ছেড়ে দেব, অনাথ এবং দুর্বলদের সম্পদ খাব না, পবিত্র মহিলাদের ওপর কোন অপবাদ আরোপ করব না, নামায পড়ব এবং দান খয়রাত করব।

আমরা তাঁর এই পয়গামকে এবং তাঁকে সত্য বলে মনে করেছি এবং আমরা এর উপর ঈমান এনে মুসলমান হয়েছি।"

হযরত জাফর (রা.)-এর জবাবে বাদশাহ নাজ্জাশি খুব বেশি প্রভাবিত হলেন। তিনি দূতদের এই বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, এই লোকেরা এখন এখানে থাকবে।

মক্কায় খাত্তাবের পুত্র উমার অত্যন্ত রাগী কিন্তু খুবই বাহাদুর ও সাহসী ব্যক্তি ছিল। আল্লাহর রাসূল (স.) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, যদি উমার ঈমান এনে মুসলমান হয়ে যেত তাহলে ইসলামের বড় সহায়ক হ'ত। কিন্তু উমার মুসলমানদের প্রতি নিতান্তই নির্দয় ছিল। যখন উমার জানতে পারল যে, নাজ্জাশী মুসলমানদের সেখানে আশ্রয় দিয়েছেন, তখন খুবই ক্রুদ্ধ হ'ল। উমার ভাবল, সমস্ত ফাসাদের মূল মুহাম্মাদই (সা.)। এখন আমি তাঁকেই মেরে দিয়ে ফাসাদের এই মূলকেই খতম করে দেব।

এই চিন্তা-ভাবনা করে উমার তলোয়ার উন্মুক্ত করে চলল। পথিমধ্যে নুয়াইম বিন্ আব্দুল্লাহর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হ'ল। নুয়াইম পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু উমারের তা জানা ছিল না। কথাবার্ত্তায় নুয়াইম বুঝতে পারল যে, উমার আল্লাহর রাসূল (স.)-কে হত্যা করতে যাচ্ছে। তখন উমারের ইচ্ছাকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য বলল--"তোমার বোন ও ভগ্নিপতি মুসলমান হয়ে গেছে, প্রথমে তাদেরকে সামলাও।"

তার বোন ও ভগ্নিপতি মুহাম্মাদের ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেছে একথা শুনতেই উমার রাগে পাগল হয়ে গেল এবং সোজা বোনের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হ'ল।

ভিতর থেকে কিছু পড়ার আওয়াজ আসছিল। ঐ সময় হযরত খাব্বাব (রা.) কুরআন পড়ছিলেন। তিনি উমারের আওয়াজ শুনতে পেয়েই ভয়ে ভীত হয়ে ভিতরে লুকিয়ে পড়লেন। কুরআনের যে পাতাগুলি তিনি পড়ছিলেন, উমারের বোন ফাতিমা (রা.) সেগুলি লুকিয়ে রাখল। তারপর ভগ্নিপতি সাঈদ (রা.) দরজা খুলে দিলেন। "তোমরা কি মনে করেছ যে, তোমাদের মুসলমান হওয়ার খবর আমার কাছে নেই?"--একথা বলেই উমার বোন ও ভগ্নি পতিকে প্রহার করতে শুরু করে দিল। এবং এত বেশি মারল যে, বোনের মাথা ফেটে গেল। কিন্তু এত সময় ধরে মার খাওয়ার পরও তার বোন ইসলাম ত্যাগ করতে অস্বীকার করল।

বোনের এই দৃঢ় সংকল্প উমারের মনোবাসনাকে নাড়িয়ে দিল। তিনি বোনকে কুরআনের পাতাগুলি দেখাতে বললেন। কুরআনের সেই পাতাগুলি পড়ার পর উমারেরও মনে পরিবর্তন এল। এখন তিনি মুসলমান হওয়ার বাসনায় মুহাম্মাদ (স.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রওয়ানা হলেন।

উমার আল্লাহর রাসূল (স.)-কে বললেন- "আমি ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রাসূল। এখন আমি মুসলমান।"

এইভাবে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছিল। এ কাজ বন্ধ করার জন্য কুরাইশরা নিজেদের মধ্যে এক আপোষ পরামর্শ করল। এই পরামর্শ অনুসারে কুরাইশ সর্দাররা মুহাম্মাদ (স.)-এর পরিবারের প্রধান আবু তালিবের কাছে গেল এবং তাঁকে বলল : "আপনি মুহাম্মাদকে আমাদের হাতে তুলে দেন। আমরা তাকে হত্যা করে ফেলব। এবং এই খুনের বদলায় আমরা আপনাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দেব। যদি আপনি তা না করেন, তাহলে আমরা ঘেরাও করব এবং আপনাদের সবাইকে নজরবন্দী করে রাখবো। কখনও আপনাদের কাছ থেকে না কিছু কিনব, আর না কিছু বেচব। কোন প্রকারের লেনদেন করব না। আপনারা ক্ষুধায় তড়পাতে তড়পাতে মরবেন।"

আবু তালিব তাদের হাতে মুহাম্মাদ (স.)-কে সমর্পণ করে দিতে রাজী হ'ল না, যার ফলে মুহাম্মাদ (স.) ও তাঁর চাচা আবু তালিবকে পুরো পরিবারবর্গসহ একটা উপত্যকায়

নজরবন্দী করে রাখা হ'ল। ক্ষুধার জ্বালায় তাদেরকে গাছের পাতা পর্যন্ত খেতে হ'ল। দীর্ঘদিন পর কতিপয় সহৃদয় মুসলমানদের প্রয়াসে এই নজরবন্দী শেষ হ'ল।

এর কিছুদিন পর চাচা আবু তালিব মারা গেলেন। অল্প কয়েকদিন পরেই বিবি খাদিজা (রাযিঃ)ও আর থাকলেন না (ইন্তেকাল করলেন)।

মক্কায় কাফিররা খুবই চেষ্টা করেছে যে, মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানো ছেড়ে দিক। চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর ঐ কাফিরদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। একদিন মুহাম্মাদ (স.) কাবাঘরে নামায পড়ছিলেন। কোন একজন উটের নাড়িভুঁড়ি এনে তাঁর মাথায় ফেলে দিল। তথাপি তিনি ভাল- মন্দ কিছুই বললেন না, এমনকি কোন বদ-দোয়াও করলেন না।

এমনিভাবে মুহাম্মাদ (স.) একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় কোন একজন তাঁর মাথায় মাটি ফেলে দিল। তিনি বাড়ীতে ফিরে আসলেন। পিতার উপর ক্রমাগতভাবে এরকম অত্যাচার হচ্ছে এইসব ভাবনা-চিন্তা করে কন্যা ফাতিমা (রা.) তাঁর মাথা ধুয়ে দিতে দিতে কেঁদে ফেললেন। মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে মুহাম্মাদ (স.) বললেন "বেটি ! কেঁদো না। আল্লাহ তোমার পিতাকে সাহায্য করবেন।"

মুহাম্মাদ (স.) কুরাইশদের অত্যাচারে যখন অতিষ্ঠ হয়ে গেলেন, এবং তাদের বাড়াবাড়ি অসহনীয় হয়ে পড়ল, তখন তিনি তায়েফে[৪] গেলেন। কিন্তু ওখানে কেউই তাঁর অবস্থান করাকেও পছন্দ করল না। আল্লাহর পয়গামকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে মুহাম্মাদ (স.)-কে আল্লাহর রসূল হিসাবে মানতে অস্বীকার করল। এমনকি সাকীফ কবীলার এক সরদার তায়েফের গুন্ডাদের মুহাম্মাদ (স.)-এর পিছনে লেলিয়ে দিল। তারা পাথর মেরে মেরে তাঁকে গুরুতরভাবে জখম করে দিল। কোনক্রমে তিনি আঙুরের এক বাগানে পৌঁছে নিজের প্রাণ রক্ষা করলেন।

মক্কায় কুরাইশরা যখন তায়েফের সমস্ত ঘটনা জানতে পারল, তখন তারা খুবই খুশি হ'ল। মুহাম্মাদ (স.)-কে নিয়ে খুবই হাসিঠাট্টা করতে শুরু করল। তারা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিল যে, যদি মুহাম্মাদ মক্কায় ফিরে আসে তাহলে তাকে হত্যা করব।

মুহাম্মাদ (সা.) তায়েফ থেকে মক্কার দিকে রওনা হলেন। হিরা নামক স্থানে যখন পৌঁছালেন তখন কুরাইশদের কিছু লোক পেয়ে গেলেন। এই লোকেরা মুহাম্মাদ (স.)-এর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তাদের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে, কুরাইশরা তাঁকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত। আল্লাহর রাসূল তাঁর স্ত্রী খাদীজার এক আত্মীয় আদীর ছেলে মুতইমের

৪. তায়েফ ছিল একটি মরুদ্যান। মক্কার ধনী কুরাইশ সর্দারদের আঙুরের বাগান, চাষাবাদের জমি ও মহল ছিল সেখানে। সাকিফ গোত্রের লোকেরা এসব দেখাশোনা করত। মরুভূমির মধ্যে ফসলাদি ও বৃক্ষ জন্মানোর উপযোগী উর্বর জমিকে মরুদ্যান বলে।

আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। যেহেতু মুহাম্মাদ (স.)-কে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে সেই জন্য কেউ কিছু বলল না। কিন্তু মুহাম্মাদ (স.) যখন কাবাতে পৌঁছলেন তখন আবু জাহল তাঁকে খুব বিদ্রুপ করলেন।

মুহাম্মাদ (স.) সত্য প্রচারের কাজ করতে থাকলেন। তিনি আরবের অন্যান্য কাবীলাকেও ইসলামের দিকে আহ্বান জানানো শুরু করে দিলেন। পরিণামে মদীনাতে ইসলাম প্রসার হতে লাগল। মদীনাবাসীরা আল্লাহর রাসূলের কথার উপর ঈমান (বিশ্বাস) আনার সাথে সাথে তাঁকে সুরক্ষা দেওয়ারও প্রতিজ্ঞা করল। মদীনাবাসীরা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিল যে, এবার যখন তারা হজ করতে মক্কায় যাবে তখন তাদের প্রিয় রাসূল (স.)-কে মদীনায় আসার আমন্ত্রণ জানাবে।

যখন হজের সময় আসল তখন মদীনা থেকে মুসলমান এবং অ-মুসলিমদের এক বড় কাফেলা হজের উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হ'ল। মদীনার মুসলমানদের সঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর সাক্ষাৎ হ'ল কাবাতে। এদের মধ্যে থেকে ৭৫ জন লোক, যার মধ্যে দু'জন মহিলাও ছিল, পূর্ব নির্ধারিত স্থানে রাত্রে মুহাম্মাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। আল্লাহর রাসূল (স.)-এর সঙ্গে কথোপকথনের পর মদীনবাসীরা সত্যকে এবং সত্য প্রচারকারী আল্লাহর রাসূল (স.)-কে রক্ষা করার জন্য বাইয়াত নিল (অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা করল)।

রাত্রের এই বাইয়াতের সব খবর কুরাইশরা পেয়ে গিয়েছিল। সকালে যখন কুরাইশরা জানতে পারল যে, মদীনার লোকেরা বের হয়ে গেছে তখন তারা তাদের পিছু ধাওয়া করল, কিন্তু ধরতে পারল না। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি সা'দ (রা.) ধরা পড়ে গেলেন। কুরাইশরা তাঁকে মারতে মারতে চুল ধরে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে মক্কায় নিয়ে আসল।

মক্কাতে কুরাইশদের অত্যাচার মুসলমানদের জন্য অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। এজন্য মুহাম্মাদ (স.) মুসলমানদের মদীনায় চলে যেতে বললেন এবং পরামর্শ দিলেন যে, "একজন একজন করে, দুইজন দুইজন করে বের হও যাতে কুরাইশরা তোমাদের পরিকল্পনা জানতে না পারে। মুসলমানরা গোপনে চুপিসাড়ে মদীনার দিকে যেতে শুরু করল। অধিকাংশ মুসলমান চলে গেল, কিন্তু কতিপয় লোক কুরাইশদের হাতে ধরা পড়ে গেল এবং তাঁদেরকে বন্দী করা হ'ল। তাঁদের উপর নির্মম ও অকথ্য অত্যাচার চালানো হ'ল যাতে তাঁরা মুহাম্মাদ (স.)-এর প্রচারিত ধর্ম ত্যাগ করে বাপ-দাদাদের ধর্মে ফিরে আসে। মক্কাতে এই বন্দী মুসলমানরা ছাড়াও আল্লাহর রাসূল (স.), আবু বকর (রা.) এবং আলী (রা.)ও থেকে গিয়েছিলেন। এঁদের ধরার জন্য কাফিররা ওৎ পেতে বসেছিল।

মদীনায় মুসলমানদের হিজরতের ফল এই হ'ল যে, মদীনাতে ইসলামের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়ে গেল। মানুষরা খুব দ্রুত মুসলমান হতে লাগল।

মুসলমানদের ক্ষমতা বাড়তে শুরু করল। মদীনাতে মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি হতে

দেখে কুরাইশরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। অতঃপর একদিন কুরাইশরা নিজেদের মন্ত্রণাগৃহ 'দারুননাদ্‌ওয়াতে' সমবেত হ'ল। সেখানে তারা একত্রিত হয়ে এমন উপায় বের করার জন্য চিন্তা-ভাবনা করতে লাগল যাতে মুহাম্মাদ (স.)-কে শেষ করে দেওয়া যায় এবং ইসলামের প্রচার-প্রসার বন্ধ হয়ে যায়। আবু জাহলের প্রস্তাবের উপর সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হ'ল যে, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে লোক নিয়ে একসাথে মুহাম্মাদের (স.) উপর হামলা চালিয়ে তাঁকে হত্যা করা হোক। তাহলে মুহাম্মাদের (স.) পরিবার পরিজনের পক্ষে সম্মিলিত সমস্ত গোত্রের হামলার মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না এবং আপোষ করতে বাধ্য হবে।

পূর্ব নির্ধারিত রাত্রে কুরাইশরা হত্যা করার জন্য মুহাম্মাদ (স.)-এর বাড়ী চতুর্দিক থেকে ঘিরে রাখল যেন মুহাম্মাদ (স.) বের হলেই তাঁকে হত্যা করা যায়। কিন্তু এই বিপদ সংকটে আল্লাহ মুহাম্মাদ (স.)-কে সতর্ক করে দিলেন। তিনি নিজের খুল্লতাত ভাই আলী (রা.)-কে, যিনি রাসূলের সঙ্গে থাকতেন, বললেন--

"আলী ! আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি হিজরত করার আদেশ পেয়েছি। শত্রুরা আজ আমার ঘরকে ঘিরে রেখেছে এবং হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি মদীনায় চলে যাচ্ছি। তুমি আমার বিছানায় আমারই চাদর মুড়ে নিয়ে শুয়ে পড়। আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। সকালে সকলের আমানত ফিরিয়ে দিও। পরে তুমিও মদীনায় চলে আসবে।"

কুরাইশরা যদিও মুহাম্মাদ (স.)-এর প্রাণের শত্রু ছিল তথাপি তারা তাঁর (স.) কাছে তাদের মাল আমানত (গচ্ছিত) রাখত। এই সময়ও তাঁর (স.) কাছে মানুষের প্রচুর মাল গচ্ছিত ছিল। এজন্য তিনি (স.) আলী (রা.)-কে নিজের সঙ্গে নিলেন না। লোকেদের গচ্ছিত সম্পদকে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আলীকে (রা.) মক্কায় ছেড়ে গেলেন।

হযরত মুহাম্মাদ (স.) তাঁর প্রিয় সাথী আবু বকর (রা.)কে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। মদীনা, মক্কার উত্তর দিকে অবস্থিত। কিন্তু শত্রুদের হাতে থেকে বাঁচতে তিনি মক্কার দক্ষিণ দিকে ইয়েমেন যাওয়ার রাস্তার উপর সউর গুহায় পৌঁছলেন। কেন না তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, শত্রুরা তাঁর সন্ধানে উত্তর দিকে যাবে। তিন দিন যাবৎ ওই গুহায় অবস্থান করতে থাকলেন। যখন হযরত মুহাম্মাদ (স.) ও আবু বকর (রা.)-র খোঁজাখুঁজি বন্ধ হয়ে গেল তখন তাঁরা গুহা থেকে বের হয়ে মদীনার দিকে রওয়ানা দিলেন।

কয়েকদিন যাবৎ সফর করার পর ২৪ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনার আগে কুবা নামক এক বস্তিতে পৌঁছলেন। যেখানে কয়েকটি মুসলমান পরিবারের বসতি ছিল। সেখানে মুহাম্মাদ (স.) এক মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করলেন যেটা 'কুবা মসজিদ' নামে প্রসিদ্ধ। এখানে আলী (রা.)-র সঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর সাক্ষাৎ হয়ে গেল। কিছুদিন ওখানে অবস্থান করার পর পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.) মদীনায় পৌঁছে গেলেন। মদীনায় পৌঁছানোর পর সবাই তাঁকে সার্বিকভাবে সম্মানজনক ও হার্দিক স্বাগত জানালো।

আল্লাহর পয়গম্বর (স.) মদীনায় পৌঁছানোর পর সেখানে একেশ্বরবাদী সত্য ধর্ম ইসলাম খুব দ্রুততার সঙ্গে প্রসারিত হতে লাগল। সর্বদিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত কোনও পূজ্য নেই এবং মুহাম্মাদ (স.) আল্লাহর রাসূল' এরই গুঞ্জন শোনা যেতে লাগল।

কাফির কুরাইশরা, মুনাফিকদের[৫] (অর্থাৎ কপটচারীদের) সাহায্যে মদীনার খবরাখবর নিতে থাকে। সত্যধর্ম ইসলামের গতিধারাকে প্রতিহত করার জন্য তারা মদীনার উপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা করতে লাগল। কুরাইশরা ক্রমাগতভাবে কয়েক বছর ধরে মুসলমানদের উপর সর্বতোভাবে অত্যাচার করার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে শেষ করে দেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল, এমনকি মুহাম্মাদ (স.)-এর উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) নিজেদের জন্মভূমি ছাড়তে হল। যাইহোক, মুসলমানরা ধৈর্য্যের উপর অটল থাকল। কিন্তু অত্যাচারীরা মদীনাতেও তাদের পিছু ছাড়ল না এবং এক বড় সেনাদলসহ মুসলমানদের উপর আক্রমণ করল।

যখন পানি মাথার উপরে পৌঁছে গেল (অর্থাৎ বিপদ চরমসীমায় পৌঁছে গেল) তখন আল্লাহও মুসলমানদের লড়াই করার অনুমতি দিলেন। আল্লাহর হুকুম নেমে এল:

'যে সব মুসলমানদের বিরুদ্ধে (বিনা কারণে) যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদের অনুমতি দেওয়া হল (যে, তারাও লড়াই করবে) কেননা তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে এবং খোদা (তাদের সাহায্য করবেন), নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।' (কুরআন: সূরা-২২, আয়াত-৩৯)

অসত্যের সঙ্গে যুদ্ধকারী অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে গেল। সত্যধর্ম ইসলামকে রক্ষা করার জন্য মুসলমানরাও তরবারি হাতে নেওয়ার অনুমতি পেয়ে গেল। এখন জিহাদ (অন্যায় এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ) শুরু হয়ে গেল। ইসলামের শত্রুরা কয়েকবার মুসলমানদের শহর মদীনার উপর হামলা করেছিল যাতে তারা পয়গম্বর এবং পয়গম্বরের অনুসারীদের নির্মূল করতে পারে কিন্তু তারা তাদের এই অপপ্রয়াসে সফল হল না। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য এবং অন্যায়, অত্যাচার এবং সন্ত্রাসের সমাপ্তির জন্য জিহাদে (অর্থাৎ ধর্মরক্ষা ও আত্মরক্ষা করার জন্য যুদ্ধে) আল্লাহর রাসূল (স.)-এর বিজয় হতে থাকল। মক্কা এবং আশেপাশের কাফির ও মুশরিকরা মুখ থুবড়ে পড়ল। এরপর পয়গম্বর (স.) দশ হাজার মুসলমান সৈন্য সহকারে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন অসত্য ও সন্ত্রাসবাদকে শেষ করে দেওয়ার জন্য। আল্লাহর রাসূল (স.)-এর সাফল্য

---

৫. মুনাফিক-- কপটচারী, কপট, ছলনাকারী ইত্যাদি। এমন ব্যক্তি যে নিজেকে মুসলমান বলে কিন্তু ইসলামের সঙ্গে তার সত্য সঠিক সম্পর্ক নেই। ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্য যে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

এবং মুসলমানদের বিপুল শক্তি দেখে কাফিররা হাতিয়ার ফেলে দিল। বিনা রক্তক্ষয়ে ও কোনও কিছু নষ্ট ও বরবাদ না করে মক্কা জয় করে নিল। এভাবে সত্য ও শান্তির জয় এবং অসত্য ও অত্যাচারের পরাজয় হল।

যে মক্কায় কাল অন্যায় ও অপমান ছিল, সেই মক্কায় আজ পয়গম্বর এবং মুসলমানদের অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে। উদারতা এবং দয়ালুতার প্রতিমূর্তি আল্লাহর রাসূল (স.) সেইসব লোকদের ক্ষমা করে দিলেন, যারা তাঁর (স.) এবং মুসলমানদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার করেছিল এবং নিজের মাতৃভূমি ছাড়তে বাধ্য করেছিল। সেদিন ঐ মক্কাবাসীরাই আল্লাহর রসূলের সামনে খুশিতে বলছিল--

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এবং দলে দলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছিল (কলেমা শাহাদতের উপরে):

'আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'

(আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেউ পূজ্য নয় এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল (স.)।

হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর পবিত্র জীবনী পড়ার পর আমি উপলব্ধি করেছি যে, পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.) একেশ্বরবাদের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অশেষ কষ্ট ভোগ করেছেন। মক্কার কাফিররা সত্য ধর্মের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য মুহাম্মাদ (স.)-এর এবং তাঁর প্রদর্শিত সত্যপথের অনুসারী মুসলমানদেরকে ক্রমাগত ১৩ বৎসর যাবৎ সর্বপ্রকারে নিপীড়িত এবং অপমানিত করতে থাকে, এই ঘোরতর অত্যাচার সত্ত্বেও মুহাম্মাদ (স.) ধৈর্যধারণ করেছিলেন। এমনকি তাঁকে তাঁর মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনাতে চলে যেতে হয়েছিল। যখন অত্যাচার চরম সীমায় পৌঁছে গেল তখন নিজের ও মুসলমানদের এবং সত্যকে রক্ষা করার জন্য বাধ্য হয়ে মুহাম্মাদ (স.)-কে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এইভাবে মুহাম্মাদ (স.) ও মুসলমানদের উপর যুদ্ধকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে সত্যকে রক্ষা করার জন্য জিহাদ (অর্থাৎ আত্মরক্ষা এবং ধর্ম রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ) সংক্রান্ত আয়াতগুলি এবং অন্যায়কারী ও অত্যাচারী কাফির ও মুশরিকদের শাস্তি সংক্রান্ত আয়াতগুলি আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ (স.)-এর উপর আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (স.) কৃত যুদ্ধগুলি আক্রমণ করার জন্য ছিল না বরং আক্রমণ ও সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য ছিল। কেননা, অত্যাচারীদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করা ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত না।

আল্লাহর রাসূল (স.) সত্য ও শান্তির স্বার্থে চরমসীমা পর্যন্ত ধৈর্য্য ধারণ

করেছিলেন এবং ধৈর্য্যের চরম সীমার পর থেকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এই ধরনের যুদ্ধকেই ধর্মযুদ্ধ (অর্থাৎ জিহাদ) বলা হয়। বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, কুরাইশরা যারা মুহাম্মাদ (স.) এবং মুসলমানদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করেছিল, মক্কা বিজয়ের দিন তারা থর থর করে কাঁপছিল-- আজ তাদের কি দশা হবে? কিন্তু মুহাম্মাদ (স.) তাদের সকলকে ক্ষমা করে দিলেন এবং গলায় গলায় জড়িয়ে নিলেন।

আল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ (স.)-কে কোনও একটা দেশ কিংবা কোনও একটা সম্প্রদায়ের জন্য পয়গম্বর রূপে প্রেরণ করেননি বরং গোটা বিশ্বের জন্য এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য পয়গম্বর রূপে প্রেরণ করেছেন। কুরআনের সূরা-৭, আয়াত-১৫৮ তে বলা হয়েছে:

> 'হে মুহাম্মাদ!) বল, হে মানুষরা! আমি তোমাদের সবার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (হিসেবে এসেছি), আল্লাহ যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনও মাবুদ (পূজ্য) নেই, তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান, অতএব তোমরা (সেই) মহান আল্লাহর উপর ঈমান আনো, যে (রসূল নিজেও) আল্লাহ ও তাঁর বাণীকে বিশ্বাস করে এবং তোমরা তাঁকে অনুসরণ কর, আশা করা যায় তোমরা হেদায়াত পাবে।'

পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর পবিত্র জীবনী থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের অন্তিম উদ্দেশ্য হল পৃথিবীতে সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরোধিতা করা। সুতরাং ইসলামকে হিংসা, সন্ত্রাস এবং আতঙ্কের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া সবচেয়ে বড় মিথ্যা। যদি এমন কোনও ঘটনা ঘটে তাহলে তার জন্য ইসলামকে এবং গোটা মুসলিম সম্প্রদায়কে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে না।

ইসলাম এবং সন্ত্রাস

এখন ইসলামকে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য আমরা ইসলামের বুনিয়াদ কুরআনের দিকে আলোচনায় যাব।

ইসলাম ঃ সন্ত্রাস না আদর্শ? এ বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য কুরআন মজীদের কিছু আয়াত পেশ করছি যেগুলি আমি মাওলানা ফতেহ্ মুহাম্মাদ খাঁ জলন্ধরী কৃত অনুদিত এবং মাহমুদ এ্যান্ড কোম্পানি মরোল, পাইপ লাইন, মুম্বাই-৫৯ থেকে প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে সংকলন করেছি।

পাঠকগণ এ বিষয়ে অবগত থাকবেন যে, কুরআন মজীদের অনুবাদে আমি [ ] থার্ড ব্র্যাকেট-এর মধ্যে লিখিত শব্দগুলিকে ব্যাখ্যার জন্য পেশ করছি। এই ব্র্যাকেট লেখকের পক্ষ থেকে সংযোজিত।

এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, কুরআন মজীদ অনুবাদ করার সময় একটা বিষয় বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, কোনও আয়াতের ভাবার্থ যেন একটুও পরিবর্তিত না হয়ে যায়। কেননা, কোনওভাবেই এটা পরিবর্তন করা যায় না। এ জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদকগণের অনুদিত কুরআনের অনুবাদের ভাব ও বিষয়বস্তু একই থাকে। অমুসলিম ভাইগণ যদি এই অনুবাদের কঠিন শব্দগুলিকে বুঝতে না পারেন তাহলে তাঁরা 'মধুর সন্দেশ সংগম', ই-২০, আবুল ফযল এনক্লেভ, জামিয়া নগর, নিউ দিল্লি-২৫ কর্তৃক প্রকাশিত এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ফারুক খাঁ অনুদিত 'পবিত্র কুরআন'-এরও সাহায্য নিতে পারেন।

কুরআনের প্রারম্ভ 'বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম' দ্বারা শুরু হয়েছে, যার অর্থ-- শুরু আল্লাহর নামে, যিনি অতীব কৃপাবান ও অত্যন্ত দয়ালু।'

মনোযোগ দিয়ে ভেবে দেখুন! এমন আল্লাহ, যিনি অতীব কৃপাবান এবং অত্যন্ত দয়ালু তিনি এমন নির্দেশ কিভাবে জারি করতে পারেন, যা কারও জন্য কষ্টদায়ক হবে অথবা হিংসা কিংবা সন্ত্রাস ছড়াবে? আল্লাহর এই কৃপাময়তা ও দয়ার্দ্রতার পূর্ণ প্রভাব আল্লাহর পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.)-এর ব্যবহারিক জীবনে দেখতে পাওয়া যায়। কুরআনের আয়াতসমূহ এবং পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.)-এর জীবনী থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের ঐ কাফিরদের সঙ্গে লড়াই করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যারা আক্রমণকারী ছিল, অত্যাচারী ছিল। এই লড়াই ছিল আত্মরক্ষার জন্য। দেখুন কুরআন মজীদে আল্লাহর আদেশ:

'এবং (হে মুহাম্মাদ! সেই সময়ের কথা স্মরণ কর) যখন কাফিররা তোমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল যে, তারা তোমাকে বন্দি করবে অথবা তোমাকে হত্যা করবে কিংবা তোমাকে (জন্মভূমি থেকে) নির্বাসিত করে দেবে, (এ সময় একদিকে) তারা ষড়যন্ত্র করছিল

এবং (আর এক দিকে) আল্লাহ কৌশল চালিয়ে যাচ্ছিলেন, আর আল্লাহ হলেন সর্বোৎকৃষ্ট কুশলী।' (কুরআন, সূরা-৮, আয়াত-৩০)

'এরা হচ্ছে সেইসব লোক, যাদের অন্যায়ভাবে নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে (তারা কোন অপরাধ করেনি)। হ্যাঁ, তারা বলেছিল, আমাদের পরওয়ারদিগার (মালিক) হচ্ছেন আল্লাহ এবং যদি আল্লাহ মানবজাতির একদলকে আর এক দল দিয়ে শায়েস্তা না করতে থাকেন তাহলে (পুরোহিতদের) পূজার ঘরগুলি, (খ্রীষ্টানদের) গীর্জা ঘরগুলি, (ইহুদীদের) ইবাদাতের স্থানগুলি এবং (মুসলমানদের) মসজিদ সমূহ, যেখানে বেশি বেশি করে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, সব ধ্বংস হয়ে যেত আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে সাহায্য করে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করেন। অবশ্যই আল্লাহ শক্তিমান এবং পরাক্রমশালী (অর্থাৎ প্রভুত্বশালী)।' (কুরআন, সূরা-২২, আয়াত-৪০)

'এরা কি এ কথা বলে যে, ইনি (মুহাম্মাদ) নিজের থেকে কুরআন রচনা করে নিয়েছেন? বলে দাও, যদি তোমরা (তোমাদের দাবিতে) সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে তোমরাও এইরকম দশটি আয়াত (বাক্য) তৈরী করে আনো এবং আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকতে চাও, ডেকেও নাও।' (কুরআন, সূরা-১১, আয়াত-১৩)

'(হে পয়গম্বর!) কাফিরদের জাঁকজমকপূর্ণ (দাম্ভিক) পদচারণা তোমাকে যেন ধোঁকাগ্রস্ত না করে দেয়।' (কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-১৯৬)

'যেসব মুসলমানদের বিরুদ্ধে (অনর্থক) যুদ্ধ চালানো হচ্ছিল, তাদের অনুমতি দেওয়া হল (যে, তারাও যুদ্ধ করবে), কেননা তাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছিল এবং আল্লাহ (তাদের সাহায্য করবেন, তিনি) অবশ্যই তাদের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম।'

(কুরআন, সূরা-২২, আয়াত-৩৯)

'এবং তাদেরকে (অর্থাৎ কাফির কুরাইশদেরকে) যেখানেই পাও সেখানেই তাদের হত্যা কর এবং যেসব স্থান থেকে তারা তোমাদের বহিষ্কার করে দিয়েছে তোমরাও সেসব স্থান থেকে (অর্থাৎ মক্কা থেকে) তাদেরকে বের করে দাও।'

(কুরআন, সূরা-২, আয়াত-১৯১)

''যে লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে লড়াই করে এবং দেশের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য ঐ শাস্তি--হত্যা করে ফেলা কিংবা শূলে চড়ানো, অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা। এই লাঞ্ছনা তো শুধু দুনিয়াতেই হবে, কিন্তু আখিরাতে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে অতীব (ভারী) শাস্তি।

তবে হ্যাঁ, যে লোকেরা তোমার আধিপত্যের অধীনে আসার পূর্বে তওবা করে নেবে (তারা বাঁচতে পারবে)। জেনে রাখো, আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং অনুগ্রহকারী।''

(কুরআন, সূরা-৫, আয়াত-৩৩-৩৪)

ইসলামের ব্যাপারে মিথ্যা প্রচার করা হয় যে, আল্লাহর আদেশের কারণেই মুসলমানরা অমুসলমানদের বেঁচে থাকা হারাম করে দেয়। অথচ ইসলামের কোথাও নিরপরাধীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি নেই। তাতে যে কেউ কাফির অথবা মুশরিক অথবা শত্রু হলেও। আল্লাহর এই আদেশকে বিশেষ রূপে দেখুন :

“যে লোকেরা তোমাদের সঙ্গে দ্বীনের (ধর্মের) ব্যাপারে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের সঙ্গে কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ আচরণ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। সুবিচারকারীদের সঙ্গে তো আল্লাহ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখেন (পছন্দ করেন)।” (কুরআন, সূরা-৬০, আয়াত-৮)

“আল্লাহ এই লোকদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করেন যারা তোমাদের সঙ্গে দ্বীনের ব্যাপারে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদেরকে ঘরছাড়া করার ব্যাপারে অন্যান্যদের সহযোগিতা করেছে। এই লোকদের সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব করে তারা যালিম।” (কুরআন, সূরা-৬০, আয়াত-৯)

শত্রুদের প্রতিও শক্তি প্রয়োগ বা বাড়াবাড়ি করতে ইসলাম নিষেধ করে। দেখুন:

“তোমরা আল্লাহর পথে তাদের সাথে লড়াই কর, যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে। কিন্তু বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন কোরো না। কেননা আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।” (কুরআন, সূরা-২, আয়াত-১৯০)

“এতো আল্লাহর বাণী, যা আমি যথার্থভাবে তোমাদেরকে শুনাচ্ছি এবং আল্লাহ দুনিয়াবাসীদের উপর যুলুম করতে চান না।” (কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-১০৮)

ইসলামের প্রথম উদ্দেশ্য হ'ল পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, যুদ্ধ তো শেষ বিকল্প। আর এটাই তো আদর্শ ধর্ম। নিম্নলিখিত কুরআনের আয়াতে তা দৃষ্টিগোচর হয়:

“হে পয়গম্বর ! এই কাফিরদেরকে বল, এখনো যদি তারা তাদের কাজ থেকে ফিরে আসে তাহলে পূর্বে যা কিছু হয়েছে তা মাফ করে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি তারা (পূর্বের আচরণই) করতে থাকে, তাহলে অতীত জাতিসমূহের যে পরিণতি হয়েছে, (সেই পরিণতি তাদেরও হবে)।” (কুরআন, সূরা-৮, আয়াত-৩৮)

ইসলাম শত্রুদের সঙ্গেও যথার্থ ন্যায়াচরণ করার আদেশ দেয় এবং ন্যায়ের সর্বোচ্চ আদর্শ পেশ করে। নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়ে দেখুন :

“হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায় ও ইনসাফের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যাও এবং লোকেদের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এই কথার উপর প্রস্তুত করে না দেয় যে,

তোমরা ইনসাফ পরিত্যাগ করবে। ইনসাফ করতে থাক কেননা এর মধ্যে পরহেযগারী নিহিত এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কাজ সম্পর্কে অবহিত।" (কুরআন, সূরা-৫, আয়াত-৮)

ইসলামে কোন নির্দোষীকে হত্যা করার অনুমতি নেই। এমনটা যে করে তার একটাই শাস্তি--রক্তের বদলে রক্ত। কিন্তু এই শাস্তি কেবল হত্যাকারীর পাওয়া উচিত এবং এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা নিষিদ্ধ। এটাকেই তো বলা হবে প্রকৃত ন্যায়বিচার। নিম্নে উদ্ধৃত বাণীতে আল্লাহ এই আদেশ দিয়েছেন :

"এবং যে জীবিতকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম (নিষিদ্ধ) করেছেন, তাকে হত্যা করো না। কিন্তু বৈধ পন্থায় [(অর্থাৎ শরীয়তের ফাতওয়া (আদেশ) অনুযায়ী] এবং যে ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে, আমি তার উত্তরাধিকারীকে অধিকার দান করেছি (যে, যালিম হত্যাকারী থেকে বদলা নেবে)। অতএব তার উচিত যে, সে যেন হত্যার (কেসাসের) ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন না করে। সে সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী।"

(কুরআন, সূরা-১৭, আয়াত-৩৩)

ইসলাম দেশের মধ্যে হিংসার প্রসার করতে অনুমতি দেয় না। দেখুন আল্লাহর আদেশ:

"লোকদেরকে তাদের মাল কম দিও না এবং দেশে ফাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না।" (কুরআন, সূরা-২৬, আয়াত-১৮৩)

অত্যাচারীদের প্রতি আল্লাহর সতর্কবাণী :

"যারা আল্লাহর আয়াতগুলি (নির্দেশাবলী) মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং নবীদের (পয়গম্বরদের) অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং যারা ন্যায়াচরণ করার আদেশ দেয় তাদেরকেও হত্যা করে ফেলে--তাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।"

(কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-২১)

সত্যের জন্য যারা কষ্ট সহ্য করে, লড়াই করে এবং মৃত্যুবরণ করে সেইসব লোকেরা ঈশ্বরের কৃপাপ্রাপ্ত হবে। তারা হবে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ঃ

"অতএব তাদের প্রভু তাদের দোয়া কবুল করে নিলেন, (এবং বললেন যে,) আমি কারুর, পুরুষ হোক বা নারী, কাজকে বিনষ্ট করে দেব না। তোমরা সকলেই সমগোত্রীয়। সুতরাং যে লোক আমার জন্য দেশত্যাগ করেছে এবং নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে এবং লড়াই করেছে ও নিহত হয়েছে আমি তার পাপসমূহকে দূর করে দেব এবং বেহেশতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। আল্লাহর নিকট এটাই তাদের প্রতিফল। আর একমাত্র আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিফল রয়েছে।" (কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-১৯৫)

ইসলামকে বদনাম করার জন্য ক্রমাগত লেখালেখি করে প্রচার করা হয়েছে যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরে প্রচারিত এবং প্রসারিত ধর্ম। মক্কাসহ সম্পূর্ণ আরব এবং পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমানদের তলোয়ারের জোরে মুসলমান বানানো হয়েছিল। এইভাবে জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে ইসলামের প্রসার হয়েছে।

অথচ কাউকে কোন ধরনের জোর-জবরদস্তি করে মুসলমান করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। দেখুন কুরআন মজীদে আল্লাহর এই আদেশ :

‘‘কিন্তু যদি তোমার পরওয়ারদিগার (অর্থাৎ আল্লাহ) চাইতেন তাহলে যত মানুষ যমীনে রয়েছে, সবাই ঈমান আনতো। তবে কি তুমি লোকদের মুমীন (অর্থাৎ মুসলমান) হওয়ার জন্য জোর জবরদস্তি করতে চাও ?’’ (কুরআন, সূরা-১০, আয়াত-৯৯)

‘‘হে পয়গম্বর ! ইসলাম অস্বীকারকারীদের (নাস্তিকদের) বলে দাও : হে কাফিরগণ! যে সব (মূর্তি) তোমরা পূজা কর, আমি তাদের পূজা করি না। এবং যে (খোদাকে) আমি ইবাদাত করি, তাঁর ইবাদাত তোমরা করনা। এবং (আমি পুনরায় বলছি) যাকে তোমরা উপাসনা কর, আমি তার উপাসনাকারী নই। এবং না তোমরা তাঁর ইবাদাত করতে প্রস্তুত যাঁর ইবাদাত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) আর আমার জন্য আমার দ্বীন।’’ (কুরআন, সূরা-১০৯, আয়াত-১-৬)

‘‘হে পয়গম্বর ! যদি এসব লোক তোমার সঙ্গে বিতর্ক করে, তবে বলে দাও--আমি ও আমার অনুসারীরা তো আল্লাহর ফরমাবরদার (অর্থাৎ আজ্ঞাপালনকারী)। এবং আহলি কিতাব (ঐশীগ্রন্থধারী) ও অশিক্ষিত লোকদের জিজ্ঞাসা কর--তোমরাও কি (আল্লাহর ফরমাবরদার হয়ে) ইসলাম গ্রহণ করেছ ? যদি এসব লোক ইসলাম গ্রহণ করে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে তারা হেদায়াত লাভ করেছে। আর যদি তারা (তোমার কথা) না মানে, তাহলে তোমার কাজ তো কেবল আল্লাহর পয়গাম (বার্তা) পৌঁছে দেওয়া। এবং আল্লাহ (নিজের) বান্দাদের দেখছেন।’’ (কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-২০)

‘‘বল, হে আহলে কিতাব ! এসো সেই কথার দিকে যা তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একই (বলে মেনে নেয়া হয়েছে)। তা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারুর ইবাদাত (উপাসনা) করব না এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক (অর্থাৎ সঙ্গী) করব না এবং আমাদের মধ্যে কেউই আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে কর্মসম্পাদনকারী মনে করব না। যদি এসব লোক (এই কথাকে) না মানে তাহলে (তাদেরকে) বলে দাও--তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা (আল্লাহর) ফরমাবরদার।’’ (কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-৬৪)

ইসলামে কাউকে জোর জবরদস্তি করে ধর্ম পরিবর্তন করার উপর নিষেধাজ্ঞার সাথে সাথে এ কথাও বলে যে, ইসলামে কোন ধরনের জোর-জবরদস্তির কোন অনুমতি নেই। দেখুন, আল্লাহর এই আদেশ :

"দ্বীন ইসলামে (ইসলাম ধর্মে) কোন জবরদস্তি নেই।"

(কুরআন, সূরা-২, আয়াত-২৫৬)

যে মন্দ কাজ করবে এবং অসত্য নীতি অবলম্বন করবে মরণের পরবর্তী জীবনে সে তার ফল ভোগ করবে।

"হ্যাঁ, যে মন্দ কাজ করবে এবং তার পাপরাশি (সমস্ত দিক দিয়ে) তাকে ঘিরে ধরবে এমন লোক দোযখে (নরকে) যাবে। (এবং) সে চিরকাল সেখানে (জ্বলতে) থাকবে।" (কুরআন, সূরা-২, আয়াত-৮১)

সারাংশ :

পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.)-এর জীবনী এবং কুরআন মজীদের এই আয়াতগুলি অনুধাবন করার পর স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর কার্যাবলীতে এবং কুরআনের ভাষ্যে কোথাও সন্ত্রাসবাদ নেই। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ধারণা পোষণকারী ব্যক্তিরাই অজ্ঞানতাবশতঃ ইসলামের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদকে জুড়ে দেন।

কুরআনের ২৪টি আয়াত

কতিপয় মানুষ কুরআনের ২৪টি আয়াত বিশিষ্ট এক পুস্তিকা দেশবাসীর মধ্যে বিতরণ করে আসছেন কয়েক বছর ধরে, যেগুলি ভারতের প্রায় সকল ভাষাতেই মুদ্রিত। এই পুস্তিকার শিরোনাম 'কুরআনের কয়েকটি আয়াত যেগুলি ঈমানদারদের (মুসলমানদের) অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বিবাদ করার নির্দেশ দেয়।' এটা আমি এই গ্রন্থের প্রারম্ভে 'যখন আমার সত্য সম্পর্কে জ্ঞান হ'ল' অধ্যায়ে লিখেছি। এই পুস্তিকা পাঠ করে আমি বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। পুস্তিকাতে যেমন ছাপা আছে, আমি সেইমত পেশ করছিঃ

কুরআনের কয়েকটি আয়াত যেগুলি ঈমানদারদের (মুসলমানদের) অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বিবাদ করার নির্দেশ দেয়।

১. ''তারপর, যখন হারাম মাসগুলি অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদের যেখানেই পাবে, হত্যা কর। আর তাদের ধর, এবং তাদের অবরুদ্ধ কর, এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাক। তারপর যদি তারা তওবা করে নেয়, নামায প্রতিষ্ঠিত করে এবং যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল এবং করুণা প্রদর্শনকারী।'' (১০, ৯, ৫)

২. ''হে ঈমানদারগণ ! মুশরিক (মূর্তিপূজক) অপবিত্র।'' (১০, ৯, ২৮)

৩. ''নিঃসন্দেহে 'কাফির' তোমাদের দুশমন।'' (৫, ৪, ১০১)

৪. ''হে ঈমানদারগণ (মুসলমানগণ)! সেই সব কাফিরদের সাথে লড়াই কর যারা তোমাদের আশেপাশে রয়েছে, এবং এটা উচিৎ যে, তারা তোমাদেরকে কঠোরভাবে পাবে।'' (১১, ৯, ১২৩)

৫. ''যে লোকেরা আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে আমি শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করব। যখন তাদের চামড়া জ্বলে যাবে তখন আমি নতুন চামড়া তাদের জন্য বদল করে দেব যেন তারা যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রভূত্বশালী এবং তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী।(৫, ৪, ৫৬)

৬. হে ঈমানদারগণ (মুসলমানগণ)! নিজেদের পিতা এবং ভাইদেরকে নিজেদের বন্ধু বানাবে না, যদি তারা 'ঈমানে'র পরিবর্তে 'কুফরকে' পছন্দ করে। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, তারা হবে যালিম।'' (১০, ৯, ২৩)

৭. ''আল্লাহ 'কাফির' লোকদের পথ দেখান না।'' (১০, ৯, ৩৭)

৮. ‘‘হে ঈমানদার ! ...... এবং ‘‘কাফিরদের’’কে নিজেদের বন্ধু বানাবে না। আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যদি তুমি ঈমানদার হয়ে থাক।’’ (৬, ৫, ৫৭)

৯. অন্যায়কারী (অমুসলমান)দেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে।’’ (২২, ৩৩, ৬১)

১০. ‘‘(কোথায় যাবে ?)অবশ্যই তোমাদেরকে এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে তোমরা পূজা করছিলে তাকে জাহান্নামের ইন্ধন করা হবে। অবশ্যই তোমাদেরকে সেখানে যেতে হবে।’’ (১৭, ২১, ৯৮)

১১. ‘‘এবং তার থেকে বড় যালিম আর কে হবে যাকে তার ‘রবে’র আয়াতের সাহায্যে সতর্ক করা হয় এবং তা সত্ত্বেও সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ? অবশ্যই আমি এমন অপরাধীদের উপর প্রতিশোধ নেব।’’ (২১, ৩২, ২২)

১২. ‘‘আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণে গনিমতের (লুটের) মাল দান করার ওয়াদা করেছেন, যা অবশ্যই তোমাদের হস্তগত হবে।’’ (২৬, ৪৮, ২০)

১৩. ‘‘তোমরা যা কিছু গনিমতের (লুটের) মাল অর্জন করেছ তা ‘হালাল’ এবং পবিত্র মনে করে খাও।’’ (১০, ৮, ৬৯)

১৪. ‘‘হে নবী ! ‘কাফির’ ও ‘মুনাফিক’দের সাথে জিহাদ কর, এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন কর। এবং তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আর তা হচ্ছে এক নিকৃষ্ট ঠিকানা।’’ (২৮, ৬৬, ৯)

১৫. ‘‘অবশ্যই আমি ‘কুফর’কারীদের কঠোর যাতনার স্বাদ আস্বাদন করাব এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে সব থেকে নিকৃষ্ট প্রতিদান দেব, যে আচরণ তারা করে এসেছে।’’ (২৪, ৪১, ২৭)

১৬. ‘‘আল্লাহর শত্রুদের জন্য এই প্রতিদান হ’ল (জাহান্নামের) আগুন। সেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী ঘর থাকবে, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত, এটা হচ্ছে তার প্রতিফল।’’ (২৪, ৪১, ২৮)

১৭. ‘‘অবশ্যই আল্লাহ ঈমানদারদের (মুসলমানদের) কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জীবন ও সম্পদকে খরিদ করে নিয়েছেন, এরা আল্লাহর পথে লড়াই করে, অতঃপর তারা হত্যাও করে এবং নিহতও হয়।’’ (১১, ৯, ১১১)

১৮. ‘‘আল্লাহ মুনাফিক (অর্ধ মুসলিম) পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং কাফিরদের জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ (আগুনই) হবে তাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের উপর আল্লাহর অভিশম্পাত এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী যন্ত্রণা।’’ (১০, ৯, ৬৮)

১৯. "হে নবী ! তুমি ঈমানদারদের (মুসলমানদের) যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের জন্য ২০ জন লোকও যদি জমে থাকতে পারে তাহলে তারা ২০০ লোকের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মাঝে যদি ১০০ হয় তাহলে তারা ১০০০ লোকের উপর জয়ী হবে। কেননা ওরা এমন লোক, যারা কোন জ্ঞান-বুঝ রাখে না।" (১০. ৮, ৬৫)

২০. "হে ঈমানদারগণ (মুসলমানগণ)! তোমরা 'ইহুদী' এবং 'খ্রীস্টান'দের নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিয়ো না। এরা নিজেরা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এদের বন্ধু বানিয়ে নেয়, তাহলে সে তাদেরই দলভুক্ত হয়ে যাবে। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ কখনও অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।" (৬, ৫, ৫১)

২১. "কিতাব প্রাপ্তদের মধ্যে যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে না, পরকালের উপর ঈমান আনে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু হারাম করেছেন, তা হারাম বলে স্বীকার করে না, সত্যদ্বীনকে নিজের দ্বীনরূপে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না তারা অপদস্ত (অপমানিত) হয়ে স্বেচ্ছায় জিযিয়া দিতে শুরু করে।" (১০, ৯, ২৯ঃ)

২২. "......অতঃপর আমি তাদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বেলে দিলাম। এবং অচিরেই আল্লাহ তাদের বলে দেবেন যা কিছু তারা করে যাচ্ছে।" (৬, ৫, ১৪)

২৩. "তারা কামনা করে যে, তারা যেভাবে 'কাফির' হয়েছে, তোমরাও তেমনি 'কাফির' হয়ে যাও। তাহলে তোমরা একইরকম হয়ে যেতে পারো, কাজেই তুমি তাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজের সাথী বানাবে না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে। আর তারা যদি এমনটা না করে তাহলে তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে এবং তাদেরকে বধ (কতল) করবে। আর তাদের মধ্য থেকে কাউকে সাথী এবং সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করবে না।" (৫, ৪, ৮৯)

২৪. "সেই কাফিরদের সাথে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়েই তাদের শাস্তি দেবেন, তিনি তাদের অপমানিত করবেন এবং তাদের মুকাবিলায় তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন, এবং ঈমানদারদের হৃদয়কে শীতল করবেন।" (১০, ৯, ১৪)

উপরোক্ত আয়াতগুলি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এগুলিতে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, কপটতা, লড়াই-ঝগড়া, লুটপাট এবং হত্যা করার নির্দেশ পাওয়া যায়। এই কারণে দেশ এবং সারা বিশ্বে মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা সংঘটিত হয়ে থাকে।

দিল্লী প্রশাসন ১৯৮৫ সালে সর্বশ্রী ইন্দ্র সেন শর্মা এবং রাজকুমার আর্যের বিরুদ্ধে দিল্লীর মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উক্ত পুস্তিকা ছাপার অভিযোগে মুকাদ্দমা

দায়ের করেছিল। আদালত ৩১ জুলাই ১৯৮৬-তে উক্ত দুই মহানুভব ব্যক্তিকে মুক্ত করে দিয়ে এই রায় দান করেঃ

"কুরআন মজীদের মতো পবিত্র গ্রন্থকে সম্মান বজায় রেখে উক্ত আয়াতগুলির গভীর অধ্যয়নে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই আয়াতগুলি অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং ঘৃণা-বিদ্বেষের শিক্ষা দেয়। এর ফলে মুসলমান এবং দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে।" (হিন্দু রাইটার্স ফোরাম, নতুন দিল্লী-২৭ কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত এবং প্রকাশিত)

উপরোল্লিখিত এই প্যামফ্লেটের প্রথমে পোস্টার ছাপা হয়েছিল। এই পোস্টার শ্রী ইন্দ্র সেনশর্মা (তৎকালীন উপ-প্রধান, হিন্দু মহাসভা, দিল্লী) এবং শ্রীরাজকুমার আর্য ছাপিয়ে ছিলেন। এই পোস্টারে কুরআন মজীদের আয়াতগুলি মুহাম্মাদ ফারূক খান কর্তৃক হিন্দীতে অনূদিত এবং মকতবা আল হাসনাত রামপুর থেকে ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে সঙ্কলিত করা হয়েছিল। এই পোস্টার ছাপার কারণে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ধারা নং ১৫৩ এবং ১৬৫-এ অনুযায়ী (এফ.আই.আর. ২৩৭-৮৩ ইউ,-এস. ২৩৫-এ , ১ পি. সি. হাউজ কাযী, পুলিশ স্টেশন, দিল্লী) মুকাদ্দমা দায়ের করা হয়েছিল। যে মকদ্দমায় উক্ত ফায়সালা প্রদান করা হয়েছিল।

এখন আমরা দেখব যে, উক্ত পুস্তিকায় উল্লেখিত ঐসব আয়াতগুলি বাস্তবিকই কি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণার প্রসার এবং বিবাদ সৃষ্টিকারী ?

পুস্তিকায় উল্লিখিত ১নং আয়াত

"তারপর যখন হারাম মাসগুলি অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, তখন মুশরিকদের যেখানেই পাবে, হত্যা কর। এবং তাদের ধর এবং অবরুদ্ধ কর। এবং প্রতিটি ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎ পেতে থাক। তারপর যদি তারা তাওবা করে নেয়, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত দেয়, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল এবং করুণা প্রদর্শনকারী।" (কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-৫)

এই আয়াতের পটভূমিকা

হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর জীবনী থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, মক্কাতে এবং মদীনাতে যাবার পরও মুশরিক, কাফির কুরাইশরা আল্লাহর রাসূল (স.)-এর পিছনে লেগে পড়েছিল। তারা মুহাম্মাদ (স.) এবং সত্যধর্ম ইসলামকে শেষ করে দেওয়ার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করে যাচ্ছিল। কাফির কুরাইশরা আল্লাহর রাসূলের কখনো স্বস্তির সঙ্গে বসে থাকতে দেয়নি। তারা সর্বদা তাঁকে অত্যাচার করতে থাকে। এজন্য তারা সর্বদা যুদ্ধের চক্রান্ত করে যাচ্ছিল।

আল্লাহর রাসূল (স.)-এর হিজরতের ৬ষ্ঠ বছরে যিলক্বদ মাসে রাসূল (স.) স্বয়ং

কয়েক শ’ মুসলমানকে সংগে নিয়ে মদীনা থেকে মক্কার দিকে হজের জন্য রওয়ানা হলেন। কিন্তু মুনাফিকরা (অর্থাৎ কপটচারীরা) এই খবর কুরাইশদের কাছে পৌঁছে দিল। কুরাইশরা মুহাম্মাদ (স.)-কে অবরোধ করার কোনও সুযোগ হাতছাড়া করত না। এবারও তারা রাস্তার উপর ওৎ পেতে বসে পড়ল। এই খবর মুহাম্মাদ (স.) পেয়ে গেলেন। নিজের পথ পরিবর্তন করে নিলেন এবং মক্কার নিকটে হুদাইবিয়ার কুয়ার কাছে তাঁবু ফেললেন। কুয়ার নাম অনুসারে এই জায়গার নাম হুদাইবিয়া ছিল।

যখন কুরাইশরা জেনে গেল যে, মুহাম্মাদ (স.) নিজের অনুসারী মুসলমানদের সঙ্গে মক্কার নিকট পৌঁছে গেছেন এবং হুদাইবিয়াতে অবস্থান করছেন, তখন কাফিররা কিছু লোককে হুদাইবিয়া প্রেরণ করল মুহাম্মাদকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু তারা হামলা করার পূর্বেই মুসলমানদের দ্বারা পাকড়াও হয়ে গেল এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌র রাসূলের সামনে হাজির করা হ’ল। আল্লাহ্‌র রাসূল তাদের অপরাধের বোধোদয় করালেন এবং ক্ষমা করে দিলেন।

এরপর হযরত মুহাম্মাদ (স.) লড়াই, ঝগড়া, খুন, খারাবী এড়ানোর জন্য হযরত উসমান (রা.)-কে কুরাইশদের মধ্যে কথাবার্তা বলার জন্য পাঠালেন। কিন্তু কুরাইশরা হযরত উসমান (রা.)-কে বন্দী করল। এদিকে হুদাইবিয়াতে অবস্থানরত আল্লাহ্‌র রাসূল (স.) খবর পেলেন যে, হযরত উসমান (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে। একথা শুনেই মুসলমানরা হযরত উসমান (রা.)-র হত্যার বদলা নেয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিল।

যখন কুরাইশরা জানতে পারল যে, এখন মুসলমানরা মরতে ও মারতে প্রস্তুত এবং যুদ্ধ অনিবার্য, তখন তারা কথা বলার জন্য সুহায়েল বিন আমরকে হুদাইবিয়াতে হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর কাছে পাঠাল। সুহায়েলের কাছ থেকে জানা গেল যে, হযরত উসমান (রাযিঃ)-কে হত্যা করা হয়নি, তিনি কুরাইশদের কাছে বন্দী। সুহায়েল হযরত উসমান (রাযিঃ)-কে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিতে এবং যুদ্ধ রদ করার জন্য কিছু শর্ত পেশ করল।

প্রথম শর্ত ঃ এ বৎসর আপনারা সবাই উমরা (কাবা দর্শন) ব্যতিরেকে ফিরে যাবেন। আগামী বছর আসবেন এবং তিনদিন পর চলে যাবেন।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ আমাদের অর্থাৎ কুরাইশদের কোন লোক যদি মুসলমান হয়ে মদীনায় যায় তাহলে তাকে ফেরৎ পাঠাতে হবে। কিন্তু যদি কোন মুসলমান মদীনা ছেড়ে মক্কায় চলে আসে তাহলে তাকে ফেরৎ দেয়া হবে না।

তৃতীয় শর্ত ঃ যেকোনও গোত্র (কাবিলা) নিজেদের ইচ্ছামত কুরাইশদের সাথে কিংবা মুসলমানদের সাথে শামিল হতে পারবে।

চতুর্থ শর্ত ঃ এই শর্তগুলি মেনে নেওয়ার পর কুরাইশরা এবং মুসলমানরা না একে অপরের উপর হামলা করবে, আর না একে অপরের সহযোগী গোত্রগুলির উপর হামলা করবে।

এই চুক্তি ১০ বছরের জন্য সম্পাদিত হ'ল যা হুদাইবিয়ার চুক্তি নামে খ্যাত। অথচ এই শর্তগুলি একতরফা এবং অন্যায়পূর্ণ ছিল। তথাপিও শান্তি এবং ধৈর্যের দূত মুহাম্মাদ (স.) এসব মেনে নিলেন যাতে শান্তি স্থাপিত হতে পারে।

কিন্তু চুক্তি হওয়ার মাত্র দুই বৎসর পর বনু বকর নামে এক গোত্র, যারা মক্কার কুরাইশদের সহযোগী ছিল, মুসলমানদের সহযোগী গোত্র খুযায়ার উপর হামলা করে বসল। এই হামলায় কুরাইশরা বনু বকর গোত্রের সঙ্গ দিল। খুযায়া গোত্রের লোকেরা পালিয়ে গিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর কাছে পৌঁছল এবং হামলার খবর দিল।

পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.) শান্তির জন্য কতই না নমনীয় হয়ে চুক্তি করেছিলেন, এর পরেও কুরাইশরা ধোঁকা দিয়ে চুক্তি ভঙ্গ করল।

এখন যুদ্ধ আবশ্যক হয়ে গেল। ধোঁকাবাজদের শাস্তি প্রদান করা শান্তি স্থাপনের জন্য জরুরী ছিল। এই আবশ্যকতার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সূরা নং ৯-এর আয়াতগুলি অবতীর্ণ হ'ল।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নবী (স.) সূরা- ৯-এর আয়াতগুলি শোনানোর জন্য হযরত আলী (রা.)-কে মুশরিকদের কাছে পাঠালেন। হযরত আলী (রা.) সেখানে গিয়ে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে এই কথা বলে যে, মুসলমানদের জন্য আল্লাহর আদেশ এসে গেছে, সূরা-৯ এর আয়াতগুলি শুনিয়ে দিলেন।

"হে মুসলমানরা, এখন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মুশরিকদের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তি করে রেখেছিলে, সম্পর্কচ্ছেদ (এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি)।

অতএব (হে মুশরিকরা ! তোমরা) যমীনে চারমাস চলাফেরা করে নাও এবং যেনে রাখ যে, তোমরা আল্লাহকে দুর্বল ও অসহায় করতে পারবে না। এও (জেনে রেখ) আল্লাহ অবশ্যই কাফিরদের লাঞ্ছিত করবেন।

মহান হজের দিন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মানুষদের প্রতি এই ঘোষণা যে, আল্লাহ মুশরিকদের সাথে সম্পর্কহীন এবং তাঁর রাসূলও (তাঁর অনুসারী)। এখন যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। আর যদি না মানো (এবং আল্লাহর সঙ্গে মোকাবিলা কর), তাহলে মনে রেখ, তোমরা আল্লাহকে হীনবল করতে পারবে না এবং (হে পয়গম্বর !) কাফিরদের বেদনাদায়ক শাস্তির খবর শুনিয়ে দাও।"

(কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-১-৩)

আলী (রা.) মুশরিকদের উদ্দেশ্যে বলেন "এ হ'ল আল্লাহর আদেশ। এখন চুক্তি ভঙ্গ হয়ে গেছে। আর তোমরাই তা ভঙ্গ করেছ। এজন্য এখন সম্মানীয় চারমাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর তোমাদের সঙ্গে জঙ্গ (অর্থাৎ যুদ্ধ) অনিবার্য।"

চুক্তি ভঙ্গ করে হামলা যারা করেছে তাদের বিরুদ্ধে জবাবী হামলা চালিয়ে তাদেরকে দলিত মথিত করে দেয়ার অধিকার মুসলমানদের ছিল। বিশেষ করে মক্কার সেই মুশরিকদের বিরুদ্ধে যারা মুসলমানদের জন্য সর্বদা অত্যাচারী ও আক্রমণকারী ছিল। এজন্য সর্বোচ্চ ন্যায়াধীশ আল্লাহ পঞ্চম আয়াতের আদেশ প্রেরণ করেছেন।

এই পঞ্চম আয়াতের পূর্বে চতুর্থ আয়াত হ'ল :

"অবশ্য যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তি সম্পাদন করেছ, এবং তারা তোমাদের প্রতি কোন ধরনের অপরাধ করেনি এবং তোমাদের মুকাবিলায় কাউকে সাহায্য করেনি, তাহলে যে সময়সীমা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে চুক্তি করেছ তা পূর্ণ কর। কেননা, যারা পরহেযগার (আল্লাহকে ভয় করে) তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন।" (কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-৪)

এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যুদ্ধের এই ঘোষণা সেইসব মুশরিকদের বিরুদ্ধে ছিল যারা যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করেছিল, বাধ্য করেছিল। সেইসব মুশরিকদের বিরুদ্ধে নয়, যারা এমন আচরণ করেনি। যুদ্ধের এই ঘোষণা আত্মরক্ষা এবং ধর্মরক্ষার জন্য ছিল।

সুতরাং অন্যায়কারী, অত্যাচারীদের দ্বারা চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের কবল থেকে বাঁচার জন্য কৃত যেকোন প্রকারের প্রয়াসকে কোনওভাবে বিবাদ সৃষ্টিকারী প্রয়াস বলা যেতে পারে না। অত্যাচারী এবং অন্যায়কারীদের থেকে নিজের ও নিজের ধর্মকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধের জন্য নিজ সৈনিকদের উৎসাহিত করা ধর্মসম্মত।

এই পুস্তিকার মুদ্রক এবং বন্টনকারী ব্যক্তিরা কি জানেন না যে, অত্যাচারী ও অন্যায়কারীদের বিনাশ করার নিমিত্তে <u>যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার উপদেশ দান করেছিলেন ? এই উপদেশ কি লড়াই ঝগড়া সৃষ্টিকারী এবং ঘৃণা বিস্তারকারী ছিল ? যদি তা না হয়, তাহলে কেন কুরআন প্রসঙ্গে এমন কথা বলা হচ্ছে ?</u>

তাছাড়া, এই পূর্ণ সূরা সেই সময় মক্কার অত্যাচারী মুশরিকদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, যারা আল্লাহর রসূলেরই ভাই-বন্ধু কুরাইশরা ছিল।

তাহলে এসবকে কেন আজকের প্রেক্ষাপটে এবং হিন্দুদের প্রসঙ্গে তোলা হচ্ছে? হিন্দু এবং অন্যান্য অ-মুসলমানদেরকে প্ররোচিত করা, তাদের মনের মধ্যে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ভরে দেয়া এবং সর্বোপরি ইসলামের বদনাম করার জন্য এসব ঘৃণ্য চক্রান্ত নয় কি?

পুস্তিকায় উল্লিখিত ২ নং আয়াত

"হে ঈমানদারগণ ! 'মুশরিক' (মূর্তিপূজক) অপবিত্র।"

(কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-২৮)

অনবরত ঝগড়া, ফাসাদ, অন্যায়-অত্যাচার যারা করে তারা অপরাধী, অত্যাচারী নয় তো কী ?

পুস্তিকায় উল্লিখিত ৩ নং আয়াত

"নিঃসন্দেহে 'কাফির' তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"

(কুরআন, সূরা-৪, আয়াত-১০১)

প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতসারে এই আয়াতের একটা অংশমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ণ আয়াত মনোযোগ সহকারে পড়ুন ঃ

"আর যখন তোমরা সফরে যাবে, তখন নামায কম (সংক্ষিপ্ত) করে পড়বে, এতে তোমাদের কোন পাপ নেই। এই শর্তে--যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে, কাফিররা তোমাদের কষ্ট দেবে। নিঃসন্দেহে 'কাফির' তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"

(কুরআন, সূরা-৪, আয়াত-১০১)

এই পূর্ণ আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মক্কা এবং আশেপাশের কাফিররা মুসলমানদের সর্বতোভাবে ক্ষতি করতে চাচ্ছিল (হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর জীবনী দেখুন), এই ধরনের দুশমন কাফিরদের থেকে সাবধানতা অবলম্বন করার জন্যই ১০১তম আয়াতে বলা হয়েছে--"নিঃসন্দেহে 'কাফির' তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"

এর পরবর্তী ১০২ নং আয়াতে একথা আরো বেশি স্পষ্ট হয়। এখানে আল্লাহ আরো বেশি সাবধান হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন :

"এবং (হে পয়গম্বর !) যখন তুমি তাদের মধ্যে অবস্থান করবে এবং তাদের নামায পড়াতে থাকবে তখন তাদের এক জামাআত (দল) তোমার সাথে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে দন্ডায়মান থাকবে। তারা যখন সিজদা সম্পন্ন করে নেবে তখন তারা পিছনে চলে যাবে। তারপর দ্বিতীয় দল যারা নামায পড়েনি (পূর্ববর্তীদের জায়গায় চলে আসবে এবং অস্ত্র সজ্জিত অবস্থায় সাবধান হয়ে থাকবে) তারা এসে তোমার সাথে নামায আদায় করবে। কাফিররা এই সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে যে, তোমরা তোমাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজ-সরঞ্জাম থেকে একটু অসতর্ক হলেই তারা তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালাবে।"

(কুরআন, সূরা-৪, আয়াত-১০২)

পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.)-এর জীবনী এবং উপরোল্লিখিত তথ্যাবলী থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, কাফিরদের কাছ থেকে নিজেদেরকে এবং নিজেদের ধর্মকে রক্ষা করার জন্য মুসলমানদের এমনটা করার আবশ্যকতা ছিল। অতএব এই আয়াতে ঝগড়া বাধানো, ঘৃণা বিস্তার করা অথবা কপটতা করা এমন কোন কথা নেই--যেমনটা পুস্তিকায় লেখা হয়েছে। অথচ জেনে বুঝে কপটতাপূর্ণ ভঙ্গিমায় আয়াতের অর্থ পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে আয়াতের কেবল একটা অংশ উদ্ধৃত করে এবং অবশিষ্টাংশ গোপন করে জনগণকে উত্তেজিত করার, ঘৃণা বিস্তার করার এবং ঝগড়া বাধানোর কাজই তো সেই লোকেরা করছে, যারা এটা ছাপা ও সারা দেশে বন্টন করার কাজ করছে। এ ধরনের লোকদের থেকে জনগণ সতর্ক থাকবেন।

পুস্তিকায় উল্লিখিত ৪ নং আয়াত

"হে ঈমানদারগণ (মুসলমানরা) ! সেইসব কাফিরদের সঙ্গে লড়াই কর যারা তোমাদের আশেপাশে রয়েছে এবং এটা হওয়া উচিৎ যে, তারা তোমাদেরকে কঠোরভাবে পাবে।" (কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-১২৩)

পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.)-এর জীবনী এবং উপরে লিখিত তথ্যাবলী থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কাফিরদের কাছ থেকে নিজেদের এবং নিজেদের ধর্মকে রক্ষা করার জন্য মুসলমানদের এমনটা করার আবশ্যকতা ছিল। এজন্য এই আত্মরক্ষা সম্বলিত আয়াতকে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টিকারী আয়াত বলা যেতে পারে না।

পুস্তিকায় উল্লিখিত ৫ নং আয়াত

"যে লোকেরা আমার আয়াতগুলিকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে আমি শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করব। যখন তাদের চামড়া জ্বলে যাবে তখন আমি নতুন চামড়া তাদের জন্য বদল করে দেব যেন তারা যন্ত্রণার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রভূত্বশালী এবং তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী।" (কুরআন, সূরা-৪, আয়াত-৫৬)

এতো ধর্মের বিরুদ্ধে যাওয়ার কারণে দোযখে (অর্থাৎ নরকে) এই শাস্তি দেওয়া হবে। সমস্ত ধর্মে সেই ধর্মের বিধান অনুযায়ী চলার জন্য স্বর্গের অকল্পনীয় সুখ এবং বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য ভয়ানক শাস্তির কথা রয়েছে। তাহলে কুরআনে বিবৃত নরক (অর্থাৎ দোযখ)-এর শাস্তির জন্য অভিযোগ কেন ? এই প্রসঙ্গে এই পুস্তিকা মুদ্রণ ও বন্টনকারীদের হস্তক্ষেপ করার কি অধিকার আছে ? নাকি এই লোকদেরকে নরকে মানবাধিকারের চিন্তা ত্রাস্ত করে তুলতে শুরু করেছে?

পুস্তিকায় উল্লেখিত ৬ নং আয়াত

"হে ঈমানদারগণ (মুসলমানগণ)! নিজেদের পিতা এবং ভাইদেরকে নিজেদের বন্ধু বানাবে না যদি তারা 'ঈমানে'র পরিবর্তে 'কুফর'কে পছন্দ করে। এবং তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, তারা হবে যালিম।" (কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-২৩)

পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.) যখন একেশ্বরবাদের সুসংবাদ পেশ করছিলেন তখন যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (স.)-এর দ্বারা প্রচারিত তাওহীদ (অর্থাৎ একেশ্বরবাদ)-এর পয়গামের উপর ঈমান (অর্থাৎ বিশ্বাস) এনে মুসলমান হয়ে যেত এবং তারপর সে তার নিজের মা-বাপ-ভাই-বোনদের কাছে যেত, তখন একেশ্বরবাদ থেকে তার বিশ্বাসকে শেষ করে দিয়ে তাকে পুনরায় বহু ঈশ্বরবাদী বানিয়ে দিত। এই কারণে একেশ্বরবাদকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, যাতে একেশ্বরবাদের সত্যকে দাবিয়ে রাখতে না পারে। তাহলে সত্য রক্ষার জন্য অবতীর্ণ এই আয়াতকে কিভাবে ঝগড়া সৃষ্টিকারী তথা ঘৃণা

বিস্তারকারী আয়াত বলা যেতে পারে ? যিনি এমনটা বলেন তিনি জ্ঞানহীন।

পুস্তিকায় উল্লেখিত ৭নং আয়াত

"আল্লাহ 'কাফির' লোকদের পথ দেখান না।" (কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-৩৭)

আয়াতের বক্তব্য বদলানোর জন্য জেনে বুঝে এই আয়াতেরও সম্পূর্ণ পেশ করা হয়নি। এই জন্য এর সঠিক উদ্দেশ্য বোঝা যায়নি। এটা বোঝার জন্য আমি আয়াতের সম্পূর্ণটাই পেশ করছিঃ

"শান্তির কোন মাসকে সরিয়ে আগে পিছে করে দেওয়া কুফরের মধ্যে বাড়াবাড়ি করা। এর মাধ্যমে কাফিররা গুমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। এক বৎসর একটি মাসকে হালাল করে নেয়, আবার অন্য বছর তাকে হারাম বানিয়ে নেয়, যাতে সমীহ করার মাসগুলি, যেগুলিকে আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, গুণতিতে পূর্ণ করে নেওয়া যায় এবং আল্লাহ যা নিষেধ করে দিয়েছেন তাকে জায়েয করে নেওয়া যায়। তাদের মন্দ কাজগুলি তাদের কাছে ভালো হয়ে দেখা দেয়, আর আল্লাহ কাফির লোকদের হিদায়াত দান করেন না।"

(কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-৩৭)

আদাব (সমীহ) অর্থাৎ আমান (শান্তি)-এর জন্য চারটি মাস। যেগুলি হ'ল--যীলক্বদ, যীলহজ্ব, মহরম এবং রজব। এই চার মাসে লড়াই-ঝগড়া করা হয় না। কাফির কুরাইশরা এই মাসগুলির মধ্যে থেকে কোন মাসকে নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে জেনে-বুঝে আগে-পিছে করে নিয়ে লড়াই ঝগড়া করার মান্যতা দিতে থাকত। অজ্ঞানতাবশতঃ পথভ্রষ্ট হয়েছে এমন কাউকে পথ দেখানো যেতে পারে। কিন্তু যে জ্ঞাতসারে পথভ্রষ্ট হয় তাকে ঈশ্বরও পথ দেখান না। এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এই আয়াতের সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া সৃষ্টি অথবা ঘৃণা বিস্তার করার কোন সম্বন্ধ নেই।

পুস্তিকায় উল্লেখিত ৮ নং আয়াত

"হে ঈমানদারগণ ! .... এবং কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানাবে না। আল্লাহকে ভয় করতে থাক যদি তুমি ঈমানদার হয়ে থাক।" (কুরআন, সূরা-৫, আয়াত-৫৭)

এই আয়াতও অসম্পূর্ণ পেশ করা হয়েছে। আয়াতের মধ্যের অংশ জ্ঞাতসারে লোপ করার বজ্জাতি করা হয়েছে। সম্পূর্ণ আয়াত হ'ল--

"হে ঈমানদারগণ ! যে সব লোকদের তোমাদের পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, তারা এবং কাফিরদের মধ্যে যারা তোমাদের দ্বীন (ধর্ম)-কে বিদ্রুপ এবং তামাসার বস্তুতে পরিণত করে নিয়েছে, তাদেরকে নিজেদের বন্ধু বানাবে না, এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক যদি মুমিন হয়ে থাক।" (কুরআন, সূরা-৫, আয়াত-৫৭)

আয়াতটি পাঠ করলে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কাফির কুরাইশ তথা তাদের সহযোগী

ইহুদী ও খৃস্টানরা যারা মুসলমানদের ধর্ম নিয়ে হাসি-তামাসা করত, তাদেরকে বন্ধু না বানানোর জন্য এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। লড়াই-ঝগড়ায় প্ররোচনা দেওয়ার জন্য কিংবা হিংসা ছড়ানোর জন্য এই আয়াত কী করে হয় ? পক্ষান্তরে পাঠকগণ লক্ষ্য করুন--পুস্তিকায় ‘‘যারা তোমাদের দ্বীন (ধর্ম)-কে বিদ্রুপ ও তামাসার বস্তুতে পরিণত করে নিয়েছে’’ অংশটুকু জেনে বুঝে গোপন করে আয়াতের উদ্দেশ্য ও বক্তব্যকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেওয়ার চক্রান্তকারীরা কি চায় ?

পুস্তিকায় উল্লেখিত ৯ নং আয়াত

‘‘অমান্যকারী (অমুসলমান)দেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে।’’ (কুরআন, সূরা ৩৩, আয়াত-৬১)

এই আয়াতের সঠিক তাৎপর্য তখনই বোঝা যাবে যখন এর পূর্ববর্তী ৬০ নং আয়াতের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। ‘‘যদি মুনাফিক (কপটচারী) এবং সেই সব লোক যাদের মনে মলিনতা রয়েছে এবং যারা মদীনা (শহর) সম্পর্কে খারাপ খারাপ গুজব ছড়াচ্ছে, (নিজেদের এই আচরণ) থেকে বিরত না হয়, তাহলে আমি তোমাদেরকে তাদের পিছনে লাগিয়ে দেব, তাহলে তারা তোমাদের পড়শীতে থাকতে পারবে না, কিন্তু কিছু দিন,

(তারাও অমান্যকারী হবে) তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, পাকড়াও করা হবে এবং হত্যা করা হবে।’’ (কুরআন, সূরা-৩৩, আয়াত-৬০-৬১)

এই সময় মদীনা শহরে, যেখানে আল্লাহর রাসূল (স.)-এর নিবাস ছিল, কুরাইশদের হামলার সর্বৈব সম্ভাবনা ছিল। কতিপয় মুনাফেক (কপটচারী) এবং ইহুদী ও খৃস্টান লোক মুসলমানদের কাছে আসা যাওয়া করত এবং কাফির কুরাইশদের সাথেও মিলে মিশে থাকত ও গুজব ছড়াতে থাকত। যুদ্ধের মত পরিস্থিতিতে যেখানে আক্রমণের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, সেক্ষেত্রে গুজব রটনাকারী গুপ্তচররা কতটা বিপদজনক হতে পারে তার অনুমান করা যায়। বর্তমান আইনেও এইসব লোকদের শাস্তি মৃত্যুই হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাদের জন্য উক্ত শাস্তি যথার্থ। এই দন্ড ন্যায়সঙ্গত। সুতরাং এই আয়াতকে ঝগড়া সৃষ্টিকারী বলা দুর্ভাগ্যজনক।

পুস্তিকায় উল্লেখিত ১০ নং আয়াত

‘‘(কোথায় যাবে ?) অবশ্যই তোমাদেরকে এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে তোমরা পূজা করছিলে, তাকে জাহান্নামের ইন্ধন করা হবে। অবশ্যই তোমাদেরকে সেখানে যেতে হবে।’’ (কুরআন, সুরা-২১, আয়াত-৯৮)

ইসলাম একেশ্বরবাদী ধর্ম, সেই অনুসারে এক ঈশ্বর ‘আল্লাহ’ ব্যতীত অন্য কাউকে পূজা করা সবচেয়ে বড় পাপ। এই আয়াতে এই মহাপাপের কারণে আল্লাহ মরণের পর

জাহান্নাম (নরক)-এর শাস্তি প্রদান করবেন।

পুস্তিকায় উল্লেখিত ৫ নং আয়াতে আমি এই বিষয়ে লিখেছি। সুতরাং এই আয়াতকেও ঝগড়া সৃষ্টিকারী বলা ন্যায়সঙ্গত নয়।

পুস্তিকায় উল্লেখিত ১১ নং আয়াত

"এবং তার থেকে বড় যালিম আর কে হবে যাকে তার 'রবের' আয়াতের সাহায্যে সতর্ক করা হয়, এবং তা সত্ত্বেও সে মুখ ফিরিয়ে নেয়? অবশ্যই আমি এমন অপরাধীদের উপর প্রতিশোধ নেব।" কুরআন, সূরা-৩২, আয়াত-২২)

এই আয়াতেও এর পূর্বে লিখিত আয়াতের মতই আল্লাহ সেইসব লোকদের নরকের দন্ড দেবেন যারা আল্লাহর আয়াতকে মানে না। এ পরলোকের বিষয়। সুতরাং ইহকালে লড়াই ঝগড়া সৃষ্টিকারী অথবা ঘৃণা বিস্তারকারী রূপে এই আয়াতকে যুক্ত করা বজ্জাতিপূর্ণ অপকর্ম।

পুস্তিকায় উল্লেখিত ১২ নং আয়াত

"আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণে গনিমতের (লুটের) মাল দান করার ওয়াদা করেছেন। যা অবশ্যই তোমাদের হস্তগত হবে।" (কুরআন, সূরা- ৪৮, আয়াত-২০)

সর্বাগ্রে আমি এটা বলে দিতে চাই যে, গনিমতের শব্দার্থ লুট নয়, বরং এ হ'ল শত্রুদের কাছ থেকে কব্জাকৃত সম্পদ। ঐ সময় মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়ার জন্য আক্রমণ করা হ'ত কিংবা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেওয়া হ'ত। কাফির এবং তাদের সহযোগী ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ছিল। ঐরূপ শক্তিশালী শত্রুদের থেকে বাঁচার তাগিদে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে রাখার নিমিত্তে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

যুদ্ধের রীতি অনুসারে এটা বৈধ। আজও শত্রুদের কব্জাকৃত সম্পত্তি যা যুদ্ধকালীন সময়ে কব্জায় চলে আসে, বিজয়ীদের প্রাপ্য হয়। সুতরাং এই আয়াতকে বিবাদ সৃষ্টিকারী আয়াত বলা দুর্ভাগ্যজনক।

পুস্তিকায় উল্লেখিত ১৩ নং আয়াত

"তোমরা যা কিছু গনিমতের (লুটের) মাল অর্জন করেছ তা 'হালাল' এবং পবিত্র মনে করে খাও।" (কুরআন, সূরা-৮, আয়াত-৬৯)

দ্বাদশতম আয়াতে উদ্ধৃত বিতর্ক অনুসারে এই আয়াতের সম্পর্ক আত্মরক্ষার নিমিত্ত কৃত যুদ্ধে প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পদের সঙ্গে এবং যুদ্ধে উৎসাহ বজায় রাখার সঙ্গে। এই আয়াতকেও বিবাদ সৃষ্টিকারী বলা দুর্ভাগ্যজনক।

পুস্তিকায় উল্লেখিত ১৪ নং আয়াত

‘‘হে নবী ! ‘কাফির’ ও ‘মুনাফিকদের’ সাথে জিহাদ কর, এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন কর, এবং তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। আর তা হচ্ছে এক নিকৃষ্ট ঠিকানা।’’ (কুরআন, সূরা-৬৬, আয়াত-৯)

ইতিপূর্বে আমি বলেছি যে, কাফির কুরাইশরা অন্যায়কারী ও অত্যাচারী ছিল। এবং মুনাফিকরা অর্থাৎ কপট আচরণকারীরা মুসলমানদের কাছে সহানুভূতিশীলতার ভাণ করে আসত, গোয়েন্দাগিরি করত আর কাফির কুরাইশদের কাছে সব খবর পৌঁছে দিত। অর্থাৎ কাফিরদের সাথে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র রাসূল (স.)-এর প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বুনতে।

এই ধরনের অধার্মিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হ’ল অধর্মের বিনাশ সাধন করে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার কাজ। এমনই অত্যাচারী কৌরবদের জন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বলেন:

অথ চেত্ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি।।
(গীতা: অধ্যায় ২, শ্লোক-৩৩)

‘‘হে অর্জুন ! কিন্তু যদি তুমি এই ধর্মযুক্ত যুদ্ধ না কর তাহলে নিজের ধর্ম ও কীর্তিকে হারিয়ে পাপ অর্জনকারী হয়ে যাবে।’’ (গীতা, অধ্যায়-২, শ্লোক--৩৩)

তস্মাত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
(গীতা: অধ্যায় ১১, শ্লোক-৩৩)

‘‘এজন্য তুমি ওঠো ! শত্রুদের ওপর বিজয় অর্জন কর, যশ লাভ কর, ধনধান্যে সুসম্পন্ন রাজ্য ভোগ কর।’’ (গীতা, অধ্যায়-১১, শ্লোক-৩৩)

পোস্টার কিংবা পুস্তিকার মুদ্রক ও বিতরণকারী শ্রীমদ্ভাগবত গীতার এই আদেশকে কি ঝগড়া লড়াই সৃষ্টিকারী বলবেন ? যদি তা না হয়, তাহলে এই পরিস্থিতিগুলিতে আত্মরক্ষা ও ধর্মরক্ষা করার জন্য অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ (অর্থাৎ আত্মরক্ষা ও ধর্মরক্ষার জন্য কৃত যুদ্ধ) করার নির্দেশ দানকারী আয়াতকে ঝগড়া সৃষ্টিকারী আয়াত কিভাবে বলা যেতে পারে ? এটা কি অন্যায় নীতি নয়? তাহলে কোন্ উদ্দেশ্যে এসব করা হচ্ছে ?

পুস্তিকায় উল্লেখিত ১৫ নং আয়াত

‘‘অবশ্যই আমি ‘কুফর’-কারীদের কঠোর যাতনার স্বাদ আস্বাদন করাব এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে সবথেকে নিকৃষ্ট প্রতিদান দেব সেই কর্মের জন্য যা তারা করে আসছিল।’’ (কুরআন, সূরা-৪১, আয়াত-২৭)

এই আয়াতে তো লেখা হয়েছে যে, আল্লাহ কাফিরদের শাস্তি প্রদান করবেন, কিন্তু এই শাস্তি কেন দেওয়া হবে ? এর কারণ এই আয়াতের ঠিক পূর্বোক্ত আয়াতে (যার পরিপূরক আয়াত এই আয়াত) ব্যক্ত করা হয়েছে, যেটাকে এরা গোপন করেছে। এখন দুটি আয়াতকে আমি একত্রিতভাবে পেশ করছি। পাঠকগণ নিজেরাই দেখতে পাবেন কিভাবে ইসলামের বদনাম করার জন্য কেমন চক্রান্ত রচনা করা হয়েছে।

''এবং কাফিররা বলতে লাগল যে, এই কুরআন শুনবেই না এবং (যখন কেউ পড়তে শুরু করবে তখন) হৈ-হল্লা করতে থাকবে, যাতে তোমরা বিজয়ী হতে পার।

তো আমিও কাফিরদের কঠোর যাতনার স্বাদ আস্বাদন করাব এবং আমি তাদেরকে সাজা দেব সেইসব কর্মের জন্য যা তারা করে আসছিল।''

(কুরআন, সূরা-৪১, আয়াত-২৬, ২৭)

এখন যদি কেউ তার ধর্মগ্রন্থ পড়তে থাকে কিংবা নামায পড়া শুরু করে, আর সেই সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য হৈ-হল্লা শুরু করে দেওয়া কি দুষ্টামিপূর্ণ আচরণ নয় ? এই অপকর্মের শাস্তি দেওয়ার জন্য ঈশ্বর যদি বলেন তাহলে কি সেটা ঝগড়া বাধানো হলো?

আমার বুঝে আসছে না যে, পাপকার্য করার পরিণাম সম্বলিত এই আয়াতে ঝগড়া লাগানো কিভাবে নজরে আসে ?

পুস্তিকায় উল্লেখিত ১৬ নং আয়াত

''আল্লাহর শত্রুদের জন্য এই প্রতিদান হ'ল (জাহান্নামের তথা নরকের) আগুন। সেখানে তাদের জন্য চিরস্থায়ী ঘর থাকবে, তারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করত, এটা হচ্ছে তার প্রতিফল।'' (কুরআন, সূরা-৪১, আয়াত-২৮)

এই আয়াত উপরোল্লিখিত ১৫তম আয়াতের পরিপূরক আয়াত। এতে মরণের পর অবিশ্বাসী (কাফির)দের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এটা পরলোকের বিষয়। ইহলোকে এই আয়াতের সাথে লড়াই ঝগড়া বাধানো কিংবা ঘৃণা বিস্তার করানোর কোন সম্পর্ক নেই।

পুস্তিকায় উল্লেখিত ১৭ নং আয়াত

''অবশ্যই আল্লাহ ঈমানদারদের (মুসলমানদের) কাছ থেকে জান্নাতের বিনিময়ে তাদের জীবন ও সম্পদকে খরিদ করে নিয়েছেন। এরা আল্লাহর পথে লড়াই করে, অতঃপর তারা হত্যাও করে এবং নিহতও হয়।'' (কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-১১১)

গীতাতে আছে ঃ

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥

(গীতা: অধ্যায় ২, শ্লোক-৩৭)

"হয় (তুমি যুদ্ধে) নিহত হয়ে স্বর্গলাভ করবে অথবা (সংগ্রামে) বিজয়ী হয়ে পৃথিবীর রাজত্ব ভোগ করবে। এজন্য হে অর্জুন ! (তুমি) নিশ্চিতরূপে যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়ে যাও।" (গীতা, অধ্যায়-২, শ্লোক-৩৭)

গীতার এই আদেশ লড়াই-ঝগড়ায় প্ররোচনা সৃষ্টিকারী নয়, এ আদেশ অধর্মের ও প্ররোচনামূলক নয়। কেননা এতো অন্যায়কারী ও অত্যাচারীদের বিনাশ করে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্তে যুদ্ধ করার জন্য এ আদেশ।

উক্ত ঐ পরিস্থিতিতে অন্যায়কারী, অত্যাচারী মুশরিক কাফিরদের শেষ করার জন্য ঠিক এমনই আল্লাহ (অর্থাৎ পরমেশ্বর)-র আদেশও সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আত্মরক্ষা করার জন্য। তাহলে একেই বিবাদ সৃষ্টিকারী কেন বলা হ'ল ? যারা এ ধরনের কথা বলে তারা কি অন্যায় নীতি পোষণ করেন না ? এইসব লোকদের সম্পর্কে জনগণকে সাবধান থাকা উচিৎ।

পুস্তিকায় উল্লেখিত ১৮ নং আয়াত

"আল্লাহ এই মুনাফিক (অর্ধ মুসলিম) পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং কাফিরদের জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ (আগুনই) হবে তাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের উপর আল্লাহর অভিশম্পাত এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী যন্ত্রণা।" (কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-৬৮)

সূরা-৯-এর ৬৮ নং আয়াতের পূর্বের ৬৭ নং আয়াত পাঠ করার পর এই আয়াত পাঠ করুন। ৬৭ নং আয়াত হল--

"মুনাফিক পুরুষরা এবং মুনাফিক নারীরা পরস্পরে সমভাবাপন্ন (অর্থাৎ একই ধরনের)। তারা খারাপ কাজ করার জন্য বলে আর ভাল কাজ করতে নিষেধ করে এবং (খরচ করার ব্যাপারে) হাত গুটিয়ে রাখে। এরা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গেছে। অবশ্যই মুনাফিকরা অবাধ্য।" (কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-৬৭)

এখানে স্পষ্ট যে, মুনাফিক (কপটচারী) পুরুষ এবং মহিলারা মানুষদের ভাল কাজ করায় বাধা দেয় এবং মন্দ কাজে প্ররোচনা দেয়। তারা ভালো কাজের জন্য কানাকড়িও দেয় না। খোদা (অর্থাৎ পরমেশ্বরকে) কখনো স্মরণ করে না। তাঁকে অবজ্ঞা করে এবং অপকর্মে লিপ্ত থাকে। এ ধরনের পাপীদেরকে মরণের পর কেয়ামতের দিন (অর্থাৎ পুনরুত্থান ও মহাপ্রলয়ের দিন) জাহান্নাম (অর্থাৎ নরক) -এর শাস্তির সতর্কতা জ্ঞাপনকারী এই আয়াত অমঙ্গলের উপর মঙ্গলের বিজয়ের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, লড়াই ঝগড়া বাধানোর জন্য নয়।

পুস্তিকায় উল্লেখিত ১৯ নং আয়াত

"হে নবী ! তুমি ঈমানদারদের (মুসলমানদের) যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ কর। তোমাদের

মধ্যে ২০ জন লোকও যদি জমে থাকতে পারে তাহলে তারা ২০০ লোকের উপর বিজয়ী হবে। আর তোমাদের মাঝে যদি ১০০ জন হয় তাহলে তারা ১০০০ লোকের উপর জয়ী হবে। কেননা ওরা এমন লোক যারা কোন জ্ঞান বুঝ রাখে না।"

(কুরআন, সূরা-৮, আয়াত-৬৫)

মক্কার অত্যাচারী কুরাইশ এবং আল্লাহর রাসূল (স.)-এর মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে কুরাইশদের জনসংখ্যা বেশি হতো এবং সত্যের রক্ষক মুসলমানরা হতো সংখ্যায় কম। এই অবস্থায় মুসলমানদের উৎসাহ বৃদ্ধি করার জন্য এবং যুদ্ধে অটল রাখার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। এই যুদ্ধ অত্যাচারী ও আক্রমণকারী কাফিরদের বিরুদ্ধে ছিল। সমস্ত কাফিরদের কিংবা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে ছিল না। সুতরাং এই আয়াত অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ঝগড়া করার আদেশ দেয় না। একথার প্রমাণ স্বরূপ আমি একটি আয়াত উল্লেখ করছি ঃ

"যে সব লোকেরা [অর্থাৎ কাফিররা] দ্বীনের (ধর্মের) ব্যাপারে তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে না, এবং তোমাদেরকে ঘর থেকে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের সঙ্গে কল্যাণময় ও সুবিচারপূর্ণ আচরণ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায় বিচারকারীদের সাহায্য করেন।" (কুরআন, সূরা-৬০, আয়াত-৮)

পুস্তিকায় উল্লেখিত ২০ নং আয়াত

"হে ঈমানদারগণ (মুসলমানগণ)! তোমরা 'ইহুদী' ও 'খ্রিষ্টানদের' নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নিয়ো না। এরা নিজেরা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এদের বন্ধু বানিয়ে নেয় তাহলে সে তাদেরই দলভুক্ত হয়ে যাবে। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ কখনো অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করেন না।"

(কুরআন, সূরা-৫, আয়াত-৫১)

ইহুদী এবং খ্রিষ্টানরা প্রকাশ্যভাবে মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা বলত কিন্তু পিছনে তারা কুরাইশদের সাহায্য করত এবং বলত--মুহাম্মাদের সাথে লড়াই কর, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। তাদের এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যেই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের সাবধান করে দেওয়া, বিবাদ বাধানোর জন্য নয়। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ কুরআন মজীদের এই আয়াত দেখুন ঃ

"খোদা ওই লোকদের সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করে যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেছে এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বহিস্কৃত করেছে এবং বহিস্কার করার ক্ষেত্রে অন্যদের সাহায্য করেছে। তাহলে যে লোক এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে যালিম।" (কুরআন, সূরা-৬০, আয়াত-৯)

পুস্তিকায় উল্লেখিত ২১ নং আয়াত

"কিতাবপ্রাপ্তদের মধ্যে যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে না, পরকালের ওপর ঈমান আনে না,আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কিছু হারাম করেছেন তা হারাম বলে স্বীকার করে না, সত্য দ্বীনকে নিজের দ্বীনরূপে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যে পর্যন্ত না তারা অপদস্থ (অপমানিত) হয়ে স্বেচ্ছায় জিযিয়া দিতে শুরু করে।"

(কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-২৯)

ইসলাম অনুসারে তৌরাত, যবুর (ওল্ড টেস্টামেন্ট), ইঞ্জিল (নিউ টেস্টামেন্ট) এবং কুরআন মজীদ আল্লাহর প্রেরিত গ্রন্থ। এজন্য এইসব গ্রন্থের উপর পৃথক পৃথকভাবে ঈমান আনয়নকারীরা যথাক্রমে ইহুদী, খৃস্টান এবং মুসলমান কিতাবপ্রাপ্ত অর্থাৎ আহলে কিতাব রূপে কথিত। এখানে এই আয়াতে কিতাবপ্রাপ্ত বা আহলে কিতাবের অর্থ হ'ল ইহুদী এবং খ্রিস্টান। ঐশী গ্রন্থগুলি রহস্যময় হয় এজন্য এই আয়াত পাঠ করার পর মনে হয় যে, এখানে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের জোর জবরদস্তি করে মুসলমান বানানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এমনটা নয়। কেননা ইসলামে কোন ধরনের জবরদস্তির অনুমতি নেই।

কাউকে জোর পূর্বক মুসলমান বানানো হবে--এটা কুরআনে নিষিদ্ধ। দেখুন ঃ

"হে পয়গম্বর (বার্তাবাহক) ! যদি এসব লোক তোমার সাথে বিতর্ক করে, তবে তাদেরকে বল যে, আমি ও আমার অনুসারীরা তো আল্লাহর আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি এবং 'আহলে কিতাব' এবং অজ্ঞ লোকদের জিজ্ঞাসা কর তোমরাও কি (আল্লাহর আজ্ঞাবহ হয়েছ এবং) ইসলাম গ্রহণ করেছ ? যদি এসব লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে অবশ্যই হেদায়াত পেয়ে যাবে এবং যদি (তোমার কথা) না মানে, তাহলে তোমার কাজ তো শুধুমাত্র আল্লাহর পয়গাম পৌঁছে দেওয়া। এবং আল্লাহ (নিজের) বান্দাদের দেখছেন।"

(কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-২০)

"যদি তোমার পরওয়ারদিগার (অর্থাৎ আল্লাহ) চান তাহলে যত মানুষ যমীনের উপর রয়েছে, সবাই ঈমান আনতো। তাহলে তুমি কি মানুষদের ওপর জবরদস্তি করতে চাও যে, তারা সব মুমিন (অর্থাৎ মুসলমান) হয়ে যাক ?' (কুরআন, সূরা-১০, আয়াত-৯৯)

ইসলামের প্রচার প্রসারে কোন ধরনের জোর জবরদস্তি না করার আদেশ এই আয়াতগুলিতে দেওয়া সত্ত্বেও ঐ আয়াতে (২১তম) কিতাবওয়ালাদের সাথে লড়াই করার আদেশ প্রদান করার হেতু ঐটাই, যা পুস্তিকার ৮ম, ৯ম ও ২০তম আয়াতের সাপেক্ষে আমি পেশ করেছি। আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী জিযিয়া নামে ট্যাক্স অমুসলমানদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদকে রক্ষা করার বদলে আদায় করা হত। এছাড়া অন্য কোন ট্যাক্স তাদেরকে দিতে হত না। অথচ মুসলমানদের জন্য যাকাত দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। বর্তমান সরকার তো কথায় কথায় ট্যাক্স আরোপ করে রেখেছে।

পুস্তিকায় উল্লেখিত ২২ নং আয়াত

"…. অতঃপর আমি তাদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বেলে দিলাম। এবং অচিরেই আল্লাহ তাদের বলে দেবেন যা কিছু তারা করে যাচ্ছে।"

(কুরআন, সূরা-৫, আয়াত-১৪)

কপটতাপূর্ণ উদ্দেশ্যে পুস্তিকায় এই আয়াতকেও জ্ঞাতসারে অসম্পূর্ণরূপে পেশ করা হয়েছে। সম্পূর্ণ আয়াত হ'ল ঃ

"এবং যে সব লোকেরা (নিজেদের) বলে যে, আমরা নাসারা (অর্থাৎ খ্রিস্টান), আমি তাদের কাছ থেকেও আহাদ (অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি) নিয়েছিলাম। কিন্তু তারাও এই উপদেশের, যা তাদের দান করা হয়েছিল, এক অংশ ভুলে গিয়েছিল। অতঃপর আমি তাদের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বেলে দিলাম। এবং অচিরেই আল্লাহ তাদের বলে দেবেন যা কিছু তারা করে যাচ্ছে।"

(কুরআন, সূরা-৫, আয়াত-১৪)

সম্পূর্ণ আয়াত পাঠ করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, চাতুর্য ও ধোঁকাবাজীর বিরুদ্ধে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, ঝগড়া-বিবাদ বাধানোর জন্য নয়।

পুস্তিকায় উল্লেখিত ২৩ নং আয়াত

"তারা কামনা করে যে, তারা যেভাবে 'কাফির' হয়েছে তোমরাও তেমনি 'কাফির' হয়ে যাও। তাহলে তোমরা একই রকম হয়ে যেতে পারো। কাজেই তুমি তাদের মধ্য থেকে কাউকে নিজের সাথী বানাবে না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে। আর যদি তারা এমনটা না করে তাহলে তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে গ্রেফতার করবে এবং তাদেরকে বধ (কতল) করবে। আর তাদের মধ্য থেকে কাউকে সাথী এবং সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করবে না।" (কুরআন, সূরা-৪, আয়াত-৮৯)

এই আয়াতকে পূর্বের আয়াতের (৮৮ নং) সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন। তা হ'ল ঃ

"কি কারণ থাকতে পারে যে, মুনাফিক (কপট)দের ব্যাপারে তোমরা দুই গোষ্ঠীতে (অর্থাৎ ভাগে) বিভক্ত হয়ে যাচ্ছ ? পরিস্থিতি হ'ল এই যে, আল্লাহ তাদের অপকর্মের কারণে তাদেরকে মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন, তুমি কি তাকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে চাও ?" (কুরআন, সূরা-৪, আয়াত-৮৮)

এখানে স্পষ্ট যে, এর পরবর্তী ৮৯ নং আয়াত, যা পুস্তিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সব মুনাফিকদের (অর্থাৎ কপটচারী) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে যারা মুসলমানদের কাছে এসে বলত--"আমরা ঈমান এনেছি এবং মুসলমান হয়ে গেছি।" অপরদিকে মক্কার কাফিরদের কাছে গিয়ে বলত ঃ "আমরা মূর্তিপূজক। আমরা তো মুসলমানদের কাছ থেকে

গোপন খবর নিতে যাই, আর তা তোমাদের কাছে বলে দিই।'' তারা মুসলমানদের মধ্যে বসে, তাদেরকে নিজেদের বাপ-দাদার ধর্ম 'মূর্তি পূজা'র উপর ফিরে আসার জন্যও বলে। এই জন্যই এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যে, এইসব কপটচারীদের সাথে বন্ধুত্ব করো না। কেননা এরা বন্ধুই নয়। সুতরাং তাদের সত্যতার পরীক্ষা নেয়ার জন্য তাদেরকে বলো-- তোমরাও আমাদের মতো জন্মভূমি ত্যাগ করে হিজরত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি তারা তা না করে তাহলে বুঝে নাও যে, এরা অনিষ্টকারী কপটচারী গোয়েন্দা যারা কাফির শত্রুদের তুলনায় অধিক বিপজ্জনক। সে সময় যুদ্ধের পরিবেশ ছিল। যুদ্ধের দিনগুলিতে সুরক্ষার দৃষ্টিতে এই ধরনের গুপ্তচর গোয়েন্দারা অত্যধিক বিপজ্জনক হতে পারত। এদের একমাত্র শাস্তি এই হতে পারে--মৃত্যু। তাদের সন্দিগ্ধ গতিবিধির কারণেই নিষেধ করা হয়েছে যে, তাদেরকে নিজেদের না সাথী বানাবে, আর না বানাবে সহায়ক। কেননা, এমন করলে ধোঁকার পর ধোঁকাই খেতে হবে।

এই আয়াত মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, ঝগড়া বাধানো কিংবা ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য নয়।

পুস্তিকায় উল্লেখিত ২৪ নং আয়াত

''সেই কাফিরদের সাথে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়েই ওদের শাস্তি দেবেন, তিনি তাদের অপমানিত করবেন এবং তাদের মুকাবিলায় তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং ঈমানদারদের হৃদয়কে শীতল করবেন।''

(কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-১৪)

পুস্তিকায় উল্লেখিত প্রথম আয়াতে আমি বিস্তারিতভাবে বলেছি যে, কিভাবে শান্তিচুক্তি ভঙ্গ করে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সূরা-৯-এর এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়েছে। পুস্তিকায় উল্লিখিত ২৪ তম আয়াত এই সূরার। এখানে চুক্তিভঙ্গ হামলাকারী অত্যাচারীদের সঙ্গে লড়াই করা এবং তাদেরকে শাস্তি দান করার আদেশ রয়েছে আল্লাহর, যাতে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের উৎসাহ হ্রাস পায় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটাকে আরো স্পষ্ট করার জন্য কুরআন মজীদের সূরা-৯ এবং ১৪ নং আয়াতের পূর্ববর্তী দুইটি আয়াত দেখুনঃ

''এবং যদি আহাদ (অর্থাৎ চুক্তি) করার পর নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের বিদ্রুপ করতে শুরু করে, তাহলে সেই সব কাফির নেতাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, (এরা বেঈমান লোক এবং) এদের প্রতিশ্রুতির কোন বিশ্বস্ততা নেই। বিস্ময়কর নয় যে, (তারা নিজেদের তৎপরতা থেকে) বিরত হয়ে যাবে।'' (কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-১২)

''তোমরা এমন লোকদের সঙ্গে কেন লড়াই করবে না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং (আল্লাহর) বার্তাবাহককে বহিষ্কার করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছে, আর তারা তোমাদের সঙ্গে (কৃত প্রতিশ্রুতি) ভঙ্গ করা শুরু করে দিয়েছে? তোমরা কি তাদেরকে ভয়

কর? অথচ তোমরা যাকে ভয় করবে তার হকদার আল্লাহ, যদি তোমরা ঈমানদার হও।" (কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-১৩)

সুতরাং শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ সূরা-৯ এর এই আয়াতকে শান্তিভঙ্গকারী অথবা ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টিকারী বলা-- হয় ধূর্তামি নতুবা অজ্ঞানতা।

সারমর্ম :

৪০ বৎসর বয়সে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্যের সুসংবাদ প্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে জীবনের অন্তিম সময় (অর্থাৎ ২৩ বৎসর) পর্যন্ত অত্যাচারী কাফিররা মুহাম্মাদ (স)-কে স্বস্তির সাথে বসে থাকতে দেয়নি। এই মধ্যবর্তী সময়ে ক্রমাগত যুদ্ধ এবং চক্রান্তের পরিবেশ বিরাজ করছিল।

এহেন পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষার জন্য শত্রুদের থেকে সতর্ক থাকা, পরিবেশ পরিস্থিতিকে কলুষিতকারী মুনাফিকদের (অর্থাৎ কপটচারীদের) এবং অত্যাচারীদের দমন করা কিংবা তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা কিংবা তাদেরকে শাস্তি দান করা শুধুমাত্র আবশ্যক ছিল তাই নয়, বরং এটা ছিল কর্তব্য। এই ধরনের দুরাচার, অত্যাচারী এবং কপটচারীদের জন্য ঋকবেদে পরমেশ্বরের আদেশ ঃ

मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः।
विदुष्टे तस्य मेधिरास्तेषां श्रवांस्युत्तिर॥
(ऋग्वेदः मण्डल १, सुक्त ११, मंत्र-७)

ভাবার্থ :

"বুদ্ধিমান মানুষদেরকে ঈশ্বর আজ্ঞা দান করেন যে, সমঝোতা, উপঢৌকন, শাস্তি এবং বিচ্ছিন্নতার যুক্তি দ্বারা দুষ্ট ও শত্রুদের নিবৃত্ত করে বিদ্যা ও শক্তিশালী রাষ্ট্র ক্ষমতার যথাযথ উন্নতি সাধন করা উচিত। অর্থাৎ যেমন এই পৃথিবীতে কপট, ধোঁকাবাজ এবং দুষ্ট পুরুষদের বৃদ্ধি না হতে পারে, তেমনই নিরন্তর প্রয়াস হওয়া উচিত।"

(ঋকবেদ, মন্ডল-১, সুক্ত-১১, মন্ত্র-৭। হিন্দী ভাষ্য-মহর্ষি দয়ানন্দ)

সুতরাং পুস্তিকায় উদ্ধৃত ২৪টি আয়াতে আল্লাহর ঐ আদেশ রয়েছে, যেন মুসলমানরা নিজেদের এবং নিজেদের সত্যধর্ম ইসলামকে রক্ষা করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতগুলি ব্যবহারিকভাবে সঠিক। কিন্তু নিজস্ব রাজনৈতিক ফায়দা অর্জন করার জন্য কুরআন মজীদের এই আয়াতগুলির ভ্রান্ত ব্যাখ্যা পেশ করে এবং সেগুলিকে জনগণের মধ্যে বন্টন করে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মানুষ মুসলমান ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া বাধানোর এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানোর বীজ বপন করছে না কি ? এটা পরিকল্পিতভাবে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা ও প্ররোচিত করা নয় কি?

আদালতের সিদ্ধান্তের আড়াল নিয়ে ১৯৮৬ সালে মুদ্রিত এই পুস্তিকা কি উদ্দেশ্যে মুদ্রণ ও বন্টন করা হচ্ছে ?

জনসাধারণ এইসব লোকদের থেকে সাবধান থাকবেন, যারা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য এই ধরনের কাজকর্মে দেশের মধ্যে অশান্তি ছড়াতে চায়।

এইসব লোকেরা কি জানেন না যে, অন্যের কাছ থেকে সম্মান পেতে হলে প্রথমে নিজেদের অন্যকে সম্মান করা উচিৎ ? এসব মানুষদের উচিৎ সর্বাগ্রে শুদ্ধ মন নিয়ে কুরআন উত্তমরূপে পাঠ করা এবং ইসলামকে জেনে নেওয়া। তারপরই তাঁরা ইসলামের সমালোচনা করুন, অন্যথায় নয়।

এমন হতে পারে যে, এই পুস্তিকার মুদ্রক ও বন্টনকারীগণও আমার মত অজ্ঞাতসারে ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। যদি তাই হয়, তাহলে সঠিক সত্যতা অবগত হওয়ার পর বিভিন্ন ভাষায় এই পুস্তিকা মুদ্রণ ও বন্টন করা তাঁরা বন্ধ করুন। এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য প্রায়শ্চিত্য করে সার্বজনীনভাবে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা খুবই জরুরী। কয়েক দিন পূর্বে ''বৈদিক ধর্ম এবং ইসলাম'' বিষয়ে কানপুরে আয়োজিত একটি সেমিনারে আমার বক্তৃতা দেবার পর আর্য সমাজের এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

''স্বামীজী, আপনি ইসলাম প্রসঙ্গে এখন বললেন যে, ইসলাম এবং বেদের সত্যতার মধ্যে আশ্চর্যজনক সাজুয্যতা রয়েছে। আপনার পেশকৃত যুক্তিতর্কে তো এমনটাই মনে হয়। তাহলে আপনি বলুন যে, স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী লিখিত সত্যর্থ প্রকাশের[৬] ১৪তম সুমুল্লাস (অধ্যায়) কি ভুল ?'' এ এমন এক প্রশ্ন যা ঐ লোকদের মনে স্বাভাবিকভাবে আসবে যাঁরা সত্যর্থ প্রকাশ পড়েছেন।

এই প্রশ্নের উত্তর ঃ

যেমন আমি নিজের সম্পর্কে লিখেছি যে, কুরআনের আয়াত সমূহের সঠিক মতলব অনুধাবন করার জন্য কুরআনের আয়াত কেন এবং কোন্ পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়েছে এটা জানা জরুরী। সেই সাথেই কুরআন বোঝার জন্য ব্যক্তির মনে ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিকোণও থাকা উচিত। মন শুদ্ধ হওয়া উচিত। কেননা ঐশী ধর্মগ্রন্থগুলি নিতান্তই রহস্যপূর্ণ হয়ে থাকে। এগুলি উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নয়। বেদকেই ধরুন, বৈদিক মন্ত্রগুলির সঠিক

---

৬. (স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী তাঁর নিজের লিখিত একটি গ্রন্থ 'সত্যর্থ প্রকাশ'-এ প্রধান প্রধান ধর্ম ও মতাদর্শগুলির সমীক্ষা করেছেন। এই গ্রন্থের ১৪ নং সমুল্লাসে (অর্থাৎ অধ্যায়ে) ইসলাম প্রসঙ্গে ভ্রান্তিপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিমূলক মন্তব্য পেশ করেছেন।)

অর্থ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। মন্ত্রগুলির অর্থ নিরূপণ করার সময় মানুষের মানসিকতা যেমন হয় মন্ত্রগুলি বোঝার ক্ষেত্রে তা প্রভাবিত করে।

স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী খুব বড় বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু স্বামীজী আরবী ভাষা জানতেন না। আমারই মত ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ নিয়েই কুরআনের সাধাসিধা অনুবাদ দেখেছেন কিংবা শুনেছেন। তিনি এটা দেখেননি যে, কোন আয়াত কেন এবং কোন্ পরিস্থিতিতে অবতীর্ণ হয়েছে অথবা আয়াতের উদ্দেশ্য কি। অর্থাৎ আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা কি ছিল। এজন্য আমারই মত তিনি কুরআনকে নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তার প্রতি ভুল ধারণা পোষণ করে নিয়েছিলেন। স্বামীজী খুবই বড় বিদ্বান ছিলেন, তাঁর দ্বারা ভুল হয়নি, বরং ভুল ঐ ব্যক্তির হয়েছে যিনি--

(১) স্বামীজীকে কুরআন সঠিকভাবে বোঝাননি, (২)অথবা কুরআনের আয়াতগুলি সঠিকভাবে উপলব্ধি করার পদ্ধতি বলেননি। যদি স্বামীজী হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর জীবনী এবং তাঁর কথন অর্থাৎ হাদীসগুলি পড়ে নিতেন তাহলে নিশ্চিতভাবে তিনি কুরআন সম্পর্কে ঐ কথাই বলতেন অথবা লিখতেন যা আজ আমি বলছি এবং লিখছি।

কুরআনের আদর্শ

আমি অনুভব করেছি যে, ঐশী জ্ঞানপূর্ণ রহস্যময় গ্রন্থসমূহ পড়া ও বোঝার জন্য দেহের সাথে সাথে মনেরও শুদ্ধতা আবশ্যক। তবেই তার রহস্য বুঝে আসে।

এই শুদ্ধতার সাথে যখন আমি ঐশীগ্রন্থ কুরআন মজীদ পড়লাম, তখন আল্লাহর রহস্যময় আয়াতগুলির সঠিক অর্থ আমার বোধগম্য হতে লাগল। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থ কুরআন মানবতার কল্যাণের জন্য আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে যা মানবতার জন্য আদর্শই আদর্শ।

কুরআন মজীদের প্রথম সূরা ফাতিহা হল ঈশ্বর বন্দনা। এ পাঠ করার পর মন স্বতঃই এক আল্লাহ (অর্থাৎ পরমেশ্বর)-র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানতাকে স্বীকার করে নেয় এবং মন ঐ আল্লাহর প্রতি আস্থা তথা ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। মনের শুদ্ধতা ও আস্তিকতার ভাব নিয়ে পাঠকগণ স্বয়ং পাঠ করে দেখুন :

'শুরু আল্লাহর নামে, যিনি অত্যন্ত দয়াবান ও নিতান্তই করুণাময়।'

"সমস্ত ধরনের প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের [প্রাণীকূলের] পরওয়ারদিগার [পালনকর্তা]। অত্যন্ত দয়াবান ও নিতান্তই করুণাময়, ন্যায় বিচার দিবসের হাকিম (বিচারক)। (হে পরওয়ারদিগার !) আমরা তোমারই ইবাদাত (দাসত্ব ও উপাসনা) করি, এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালনা কর, সেই মানুষদের পথ যাদের প্রতি তুমি তোমার দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছ, তাদের পথ নয় যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট।" (কুরআন, সূরা-১, আয়াত-১-৭)

কুরআনের আধ্যাত্মিক দর্শণ :

"জেনে রাখ ! যে সৃষ্টি [অর্থাৎ প্রাণীকূল] আসমানে রয়েছে এবং যমীনে রয়েছে, সবকিছুই আল্লাহরই (দাস এবং তাঁর সৃষ্ট)। এবং এই যারা আল্লাহ ছাড়া (নিজেদের তৈরী করা) শরীকদের ডাকে, তারা (অন্য কোন কিছুর) অনুসরণ করে না, নিছক আন্দাজ অনুমানের অনুসরণ করে এবং নিছক কল্পনার জাল বিস্তার করে চলেছে।"

(কুরআন, সূরা-১০, আয়াত-৬৬)

"(হে নবী !) বল হে লোকেরা ! আমার দ্বীন (জীবন বিধান) সম্পর্কে যদি তোমাদের কোন রকমের সন্দেহ থাকে তাহলে (শুনে রাখ যে) তোমরা আল্লাহ ছাড়া

অন্য যে লোকদের দাসত্ব কর, আমি তাদের দাসত্ব করি না। বরং আমি আল্লাহর দাসত্ব করি যিনি তোমাদের জীবন হরণ করেন এবং আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি ঈমানদারদের (বিশ্বাসীদের) মধ্যে একজন।"

(কুরআন, সূরা-১০, আয়াত-১০৪)

"এবং আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কোন সত্ত্বাকে ডেকো না, যে তোমার না কোন ভাল করতে পারে আর না পারে কিছু ক্ষতি করতে। যদি এমন কর, তাহলে তুমি যালিমদের অন্তর্গত হয়ে যাবে।" (কুরআন, সূরা-১০, আয়াত-১০৬)

"বল, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমি কি অপর কাউকে সাহায্যকারী চিহ্নিত করেছি? (তিনিই তো)আসমান-যমীনের সৃষ্টিকারী এবং তিনি (সকলকে) খাদ্য দান করেন এবং নিজে কোন খাদ্য গ্রহণ করেন না। এও (বলে দাও) আমাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সবার আগেই আমি ইসলামের মধ্যে এসেছি এবং এটাও যে, তুমি (হে নবী) মুশরিকদের মধ্যে শামিল হয়ো না।" (কুরআন, সূরা-৬, আয়াত-১৪)

"এবং তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারে, আর না তারা নিজেদেরই সাহায্য করতে সক্ষম।"

(কুরআন, সূরা-৭, আয়াত-১৯৭)

"আর যদি তোমরা তাদেরকে সঠিক পথে আসতে আহ্বান জানাও, তাহলে তাও শুনতে পাবে না এবং তোমরা তাদেরকে দেখ যে, (মনে হবে) তারা তোমাদের দিকে নয়ন বিস্ফারিত করে দেখছে। কিন্তু (প্রকৃত পক্ষে) তারা কিছুই দেখতে পায় না।"

(কুরআন, সূরা-৭, আয়াত-১৯৮)

"তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর : আসমান ও যমীন থেকে তোমাদের কে রিযিক (খাদ্য) দান করে ? অথবা (তোমাদের) কানগুলি ও চোখগুলির মালিক কে? এবং কে নিস্প্রাণ হতে সজীব প্রাণকে সৃষ্টি করে? সজীব প্রাণ থেকে নিস্প্রাণ কে সৃষ্টি করে এবং বিশ্বের কর্মকান্ডের ব্যবস্থাপনা কে করে ? তৎক্ষণাৎ তারা বলে দেবে : আল্লাহ। সুতরাং বল : তাহলে তোমরা (আল্লাহকে) ভয় কর না কেন?

এই আল্লাহই তো তোমাদের প্রকৃত প্রভু এবং সত্য প্রকাশ হওয়ার পর পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি-ই বা অবশিষ্ট থাকে? অতএব তোমরা কোথায় যাচ্ছ?"

(কুরআন, সূরা-১০, আয়াত-৩১, ৩২)

"(তাদের) জিজ্ঞাসা কর : তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যারা সৃষ্টিকূলকে প্রথম সৃষ্টি করেছে (এবং) তারপর পুনরায় সৃষ্টি করবে ? বলে দাও, আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। তা সত্ত্বেও তোমরা কোথায় উল্টোদিকে যাচ্ছ ?

জিজ্ঞাসা কর, তোমাদের শরীকদের মধ্যে কে এমন আছে যে সত্যের দিশা দেখাবে? বলে দাও, আল্লাহই একমাত্র সত্যের দিশা দেখান। যিনি সত্যের রাস্তা দেখান, তিনিই যোগ্য নন যে, কেবল তাঁরই আনুগত্য করা হবে ? অথবা নাকি তারা যাদেরকে যতক্ষণ রাস্তা না দেখানো হবে তারা রাস্তা পায় না ? তবে তোমাদের কী হল ? কেমন ন্যায় বোধ তোমাদের ?''

(কুরআন, সূরা-১০, আয়াত-৩৪, ৩৫)

''এবং মুশরিকরা বলে, 'যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে না আমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোন জিনিসকে পূজা করতাম, আর না আমাদের বড়রাও (পূজা করত), আর না তাঁর (আদেশ) ব্যতীত কোন জিনিসকে হারাম গণ্য করতাম। (হে পয়গম্বর !) এই রকম তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা করেছিল। তাহলে পয়গম্বরদের দায়িত্ব (আল্লাহর হুকুমকে) স্পষ্ট করে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আর কিছু নেই।

এবং আমি প্রত্যেক গোষ্ঠিতে পয়গম্বর প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর ইবাদাত (দাসত্ব ও উপাসনা) কর এবং মূর্তিদের (পূজা করা থেকে) বাঁচো। এরপর তাদের মধ্যে কিছু এমন আছে যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন এবং কিছু এমন আছে যাদের উপর পথভ্রষ্টতা চেপে বসেছে। অনন্তর যমীনের উপর চলাফেরা করে দেখে নাও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কি হয়েছে।''

(কুরআন, সূরা-১৬, আয়াত-৩৫, ৩৬)

''প্রকৃত ব্যাপার হ'ল এই যে, আমি তাদের কাছে সত্যকে পৌঁছে দিয়েছি এবং এই লোকেরা (যারা মূর্তিপূজা করে) অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

আল্লাহ না কাউকে (নিজের) সন্তান বানিয়েছেন, আর না তাঁর সঙ্গে অন্য কোন মাবুদ (পূজ্য) রয়েছে।'' (কুরআন, সূরা-২৩, আয়াত-৯০, ৯১)

''বলে দাও, আমি তো আমার প্রভূরই ইবাদাত (দাসত্ব) করি এবং এও বলে দাও, আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করা এবং কল্যাণ করার কোন ক্ষমতা রাখি না।

এও বলে দাও, আল্লাহর (আযাব) থেকে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারে না এবং আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোথাও আশ্রয়স্থল দেখি না।

তবে হ্যাঁ, আল্লাহর (পক্ষ থেকে নির্দেশাবলী) এবং তাঁর পয়গাম পৌঁছে দেওয়াই (আমার দায়িত্ব) এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর বাণীবাহকের অমান্য করবে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, চিরকাল সে সেখানে অবস্থান করবে।''

(কুরআন, সূরা-৭২, আয়াত-২০-২৩)

''হে নবী ! ইসলামকে অস্বীকারকারীদের (নাস্তিকদের) বলে দাও, হে কাফিররা! যেসব (মূর্তিগুলোর) তোমরা পূজা কর, আমি তার পূজা করি না। এবং যে খোদার

আমি ইবাদাত করি, তোমরা তাঁর ইবাদাত কর না, এবং (আমি পুনরায় বলছি যে) যাদেরকে তোমরা পূজা কর, তাদের পূজক আমি নই। আর না তোমরা তাঁর ইবাদাত করতে প্রস্তুত যার ইবাদাত আমি করি। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) আর আমার জন্য আমার দ্বীন।'' (কুরআন, সূরা-১০৯, আয়াত-১-৬)

''বল তিনি (পবিত্র সত্তা যাঁর নাম) আল্লাহ একক। (তিনি) প্রকৃত মাবুদ, মুখাপেক্ষীহীন। তিনি না কারুর বাপ, আর না কারুর সন্তান। এবং কেউই তাঁর সমতুল্য নয়।'' (কুরআন, সূরা-১১২, আয়াত-১-৪)

''এবং যে সব লোকেরা আমার আয়াতগুলিকে মিথ্যা মনে করে, তারা বধির ও বোবা। (এ ব্যতিরেকে) অন্ধকারে নিমজ্জিত তারা। আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন, আর যাকে চান সহজ সঠিক পথে চালান।

বলে দাও, (কাফিররা !) ভেবে দেখতো, যদি তোমাদের ওপর আল্লাহর আযাব (শাস্তি) এসে পড়ে কিংবা কিয়ামত (মহাপ্রলয়) এসে উপস্থিত হয় তাহলে তোমরা কি (এ রকম পরিস্থিতিতে) আল্লাহ (অর্থাৎ পরমেশ্বর) ছাড়া অন্য কাউকে ডাকতে ? যদি সত্যবাদী হয়ে থাক (তাহলে বল)।

(না) বরং (বিপদের সময়) তোমরা তাঁকেই ডেকে থাক, যে দুঃখের জন্য তোমরা তাঁকে ডাক, যদি তিনি চান তাহলে তা দূর করে দেন এবং যাদেরকে তোমরা শরীক বানিয়ে নিয়েছ, (সেই সময়) তোমরা তাদেরকে ভুলে যাও।

এবং আমি তোমার পূর্বে অসংখ্য জাতির প্রতি পয়গম্বর পাঠিয়েছি। তারপর (তাদের অমান্যতার কারণে) আমি তাদেরকে বহু বিপদ ও দুঃখ কষ্টে নিমজ্জিত করে এসেছি, যেন তারা নতি স্বীকার করে।'' (কুরআন, সূরা-৬, আয়াত-৩৯-৪২)

''(হে পয়গম্বর ! কাফিরদের) বলে দাও, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাক, তাদের ইবাদাত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। (এও) বলে দাও, আমি তোমাদের কামনা বাসনার অনুসরণ করব না। এমনটা করলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব, সৎ পথের পথিক হতে এবং হেদায়াত প্রাপ্ত লোকদের সাথে শামিল থাকতে পারব না।'' (কুরআন, সূরা-৬, আয়াত-৫৬)

''তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর : আমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে সেই সবকে ডাকব যারা আমাদের না উপকার করতে পারে, আর না কোন ক্ষতি করতে ? আল্লাহ যখন আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন, তখন আমরা কি উল্টো পথে ফিরে যাব ? (তারপর আমাদের উদাহরণ কি এমন ব্যক্তির মত হবে) যাকে জ্বীন (শয়তান) জঙ্গলের মধ্যে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে (এবং সে) দিশাহারা (হয়ে চলেছে)? অথচ তার কিছু সাথী রয়েছে যারা তাকে সঠিক পথের দিকে আহ্বান জানায়--আমাদের কাছে

এসো। বল : পথ তো এটাই, যে পথ আল্লাহ বলেছেন, আর আমাকে তো এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে - বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের মালিক আল্লাহর আনুগত্যকারী হয়ে যাও।" (কুরআন, সূরা-৬, আয়াত-৭১)

"(হে পয়গম্বর !) এদেরকে বলে দাও, আমাকে তো তাদের ইবাদাত করতে নিষেধ করা হয়েছে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাক। (এবং আমি তাদের ইবাদাত কিভাবে করব) যেখানে আমার কাছে আমার প্রভূর (পক্ষ) থেকে প্রকাশ্য দলীল এসে পৌঁছেছে? আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি বিশ্বপ্রভুর নির্দেশের অনুগত হ'ব।" (কুরআন, সূরা-৪০, আয়াত-৬৬)

"তিনি তো ঐ, যিনি তোমাদেরকে (প্রথমে) মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর শুক্রকীট তৈরী করে, তারপর জমাট বাঁধা রক্ত বানিয়ে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন (যেন তোমরা) শিশুর (আকৃতি হও)। তারপর তোমরা তোমাদের যৌবনে উপনীত হও, তারপর বৃদ্ধ হয়ে যাও এবং কেউ তোমাদের মধ্যে পূর্বেই মারা যায়, এবং তোমরা (মৃত্যুর) নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৌঁছে যাও, এবং যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পার। (কুরআন, সূরা-৪০, আয়াত-৬৭)

"(হে মুহাম্মাদ !) বলে দাও : হে মানুষেরা ! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত (অর্থাৎ তাঁর রাসূল)। (তিনি) আকাশ ও যমীনের বাদশাহ, তিনি ছাড়া আর কেউ মাবুদ (অর্থাৎ পূজ্য) নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দেন। অতএব আল্লাহর উপর এবং তাঁর উম্মী পয়গম্বরের উপর ঈমান আনো যিনি আল্লাহর উপর এবং তাঁর বাণীর উপর ঈমান রাখেন। যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হতে পার।"

(কুরআন, সূরা-৭, আয়াত-১৫৮)

"এবং (হে মুহাম্মাদ !) তোমাকে যে নির্দেশ প্রেরণ করা হয়, তার অনুসরণ করতে থাক এবং (কষ্টের জন্য) ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ ফায়সালা করে দেন। তিনি সর্বোত্তম ফায়সালাকারী। (কুরআন, সূরা-১০, আয়াত-১০৯)

"বলে দাও, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা আরোপ করে, তারা ফালাহ (কল্যাণ ও সফলতা) পাবে না।

তাদের জন্য ফায়দা রয়েছে (দুনিয়াতে), তারপর তাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। সেই সময় আমি তাদেরকে কঠিন শাস্তির (মজা) আস্বাদন করাবো। কেননা তারা কুফরীর (কথা) বলতে থাকতো।"

(কুরআন, সূরা-১০, আয়াত-৬৯-৭০)

"(হে মুহাম্মাদ !) এইসব সেই (হেদায়াত সমূহের) মধ্যে যে জ্ঞানপূর্ণ কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে তোমার উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং আল্লাহর

সাথে অন্য কাউকে মাবুদ বানাবে না। (এমনটা করলে) তিরস্কৃত হয়ে এবং (আল্লাহর তরফ থেকে) ধিকৃত হয়ে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপিত হবে।''

(কুরআন, সূরা-১৭, আয়াত-৩৯)

''এবং বলে দাও, (হে লোকেরা !) এই কুরআন তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মহাসত্যের (উপর) প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনবে এবং যে চাইবে অস্বীকারকারী হয়ে থাকবে। আমি অত্যাচারীদের জন্য (নরকের) আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি যার লেলিহান শিখা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে এবং যদি তারা ফরিয়াদ করে তাহলে এমন ফুটন্ত পানি তাদেরকে পরিবেশন করা হবে যা গলিত তামার মত (উত্তপ্ত হবে এবং যা) তাদের মুখমন্ডলকে ঝলসিয়ে দেবে। (তাদের পান করার) পানি হবে নিকৃষ্ট এবং আশ্রয়স্থলও হবে নিকৃষ্ট।

(এবং) যারা ঈমান আনবে এবং সৎকর্ম করতে থাকবে, অবশ্যই আমি সৎকর্মশীলদের কর্মফল বিনষ্ট করি না।

এমন লোকদের জন্য চিরস্থায়ী বাগিচা থাকবে, যেখানে তাদের (মহলের) নীচে ঝর্ণা প্রবহমান থাকবে। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণকঙ্কন পরিধান করানো হবে এবং সেখানে তারা সূক্ষ্ম ও মসৃণ রেশমের সবুজ পোশাক পরিধান করবে (এবং) মসনদের উপর তাকিয়ায় ঠেস লাগিয়ে উপবেশন করবে। (কতই না) উত্তম প্রতিফল এবং (কতই না) উত্তম আবাসস্থল।''

(কুরআন, সূরা-১৮, আয়াত-২৯-৩১)

''এবং তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি একথা বলে যে, আল্লাহ ছাড়া আমিও মাবুদ (পূজ্য) তাহলে আমি তাকে নরকের শাস্তি দেব এবং অত্যাচারীদেরকে আমি এমনই শাস্তি দিয়ে থাকি।'' (কুরআন, সূরা-২১, আয়াত-২৯)

''এবং (হে মুহাম্মাদ !) আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণ স্বরূপ প্রেরণ করেছি।

তাদেরকে বলে দাও ঃ আমার উপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) অহী (প্রত্যাদেশ) আসে যে, তোমাদের সকলের মাবুদ (অর্থাৎ পূজ্য) একমাত্র আল্লাহ, সুতরাং তোমাদের উচিত (তোমরা আনুগত্যকারী হবে)।''

(কুরআন, সূরা-২১, আয়াত-১০৭-১০৮)

''যারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে : হে প্রভূ ! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং আমাদেরকে নরকের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

এরা সেইসব লোক যারা (বিপদের সময়) ধৈর্য্য ধারণ করে এবং সত্যবাদী এবং ইবাদাতে মশগুল থাকে এবং (আল্লাহর) রাস্তায় ব্যয় করে এবং সেহরের [অর্থাৎ

শেষ রাতের] সময় নিজেদের অপরাধ সমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে।

আল্লাহ তো একথার সাক্ষ্য দান করে থাকেন যে, তিনি ব্যতীত আর কোন মাবুদ [অর্থাৎ পূজ্য] নেই। ফেরেশতা এবং জ্ঞানবান লোকেরা, যারা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, তারাও (সাক্ষ্য দান করে যে) সেই পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী ব্যতীত আর কেউই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়।”

(কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-১৬-১৮)

“কোন বস্তুকে আল্লাহর অংশীদার বানাবে না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে (দুর্ব্যবহার করবে না, বরং) (উত্তম) আচরণ করতে থাক এবং (দারিদ্রের ভয়ে) নিজেদের সন্তানকে হত্যা করো না। কেননা, তোমাদের ও তাদেরকে আমিই খাদ্য (রুযী) দান করি। অশ্লীল কাজের কাছেও যেও না, তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন। কোন প্রাণ হত্যা করো না, আল্লাহ যাকে হত্যা করা নিষিদ্ধ করেছেন--কিন্তু বৈধ পন্থায় (অর্থাৎ) যার হুকুম শরীয়ত দিয়েছে। এই কাজগুলির প্রতি তিনি তোমাদের গুরুত্ব দিয়েছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।”

(কুরআন, সূরা-৬, আয়াত-১৫১)

“এবং এইসব লোকেদের তওবা (অনুশোচনা) গ্রহণযোগ্য হয়না, যারা (জীবনভর) দুষ্কর্ম করতে থাকে। এমনকি যখন তাদের মধ্যে কারুর মৃত্যু এসে হাজির হয়, তখন তারা সেই সময় বলতে থাকে--এখন আমি তওবা করছি এবং তাদের (তওবা কবুল হয়) না, যারা কুফরীর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এমন লোকদের জন্য আমি পীড়াদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

(কুরআন, সূরা-৪, আয়াত-১৮)

মানবতার কল্যাণের জন্য শ্রেষ্ঠ সদাচার ইসলামে রয়েছে

'এই (হত্যার) কারণেই আমি বনী ইসরাঈলের জন্যে এই নির্দেশ জারি করলাম যে, কোনও মানুষকে (অন্যায়ভাবে) হত্যা করার কিংবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ (করার শাস্তি বিধান) ছাড়া (অন্য কোনও কারণে) কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করল, (আবার এমনভাবে) যদি কেউ একজনের প্রাণ রক্ষা করে তবে সে যেন গোটা মানব জাতিকেই বাঁচিয়ে দিল। এদের কাছে আমার রাসূলরা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, তারপরও এদের অধিকাংশ লোক যমীনের বুকে সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবেই থেকে গেল।' (কুরআন, সূরা-৫, আয়াত-৩২)

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারও ঘরে-- সে ঘরের লোকদের অনুমতি না নিয়ে ও তার বাসিন্দাদের প্রতি সালাম না করে কখনও প্রবেশ করো না, এটা তোমাদের জন্য উত্তম (এবং আমি এই উপদেশ এ জন্য দিচ্ছি যে,) সম্ভবত তোমরা মনে রাখতে পারবে।' (সূরা-২৪, আয়াত-২৭)

'এবং নিজেদের কওমের মধ্যকার বিধবা মহিলাদের বিবাহের ব্যবস্থা কর এবং তোমাদের দাসদাসীদের মধ্যে যারা ভালো মানুষ তাদেরও (বিবাহের ব্যবস্থা কর), যদি তারা অভাবী হয়, (তাহলে) আল্লাহ (শীঘ্রই) তাঁর অনুগ্রহ দিয়ে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন, আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।' (কুরআন, সূরা-২৪, আয়াত-৩২)

মুমিনদের দু'টি দল যদি নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে বসে, তখন তোমরা উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে, অতঃপর তাদের একদল যদি আর এক দলের উপর যুলুম করে, তাহলে যে দলটি যুলুম করছে তার বিরুদ্ধেই তোমরা লড়াই কর-- যতক্ষণ পর্যন্ত না সে দলটি (সম্পূর্ণত) আল্লাহর হুকুমের দিকে ফিরে আসে। যদি সে দলটি (আল্লাহর হুকুমের দিকে) ফিরে আসে তখন তোমরা দুটি দলের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচারের সঙ্গে মীমাংসা করে দেবে এবং তোমরা ন্যায় বিচার করবে, অবশ্যই আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের ভালোবাসেন।

মুমিনরা তো একে অপরের ভাই, অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও, আল্লাহকে ভয় কর, আশা করা যায়, তোমাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করা হবে।

হে বিশ্বাসীরা (মুমিনরা)! তোমাদের কোনও সম্প্রদায় যেন অপর সম্প্রদায়কে উপহাস না করে, এমনও তো হতে পারে, তারা উপহাসকারীদের চাইতে উত্তম। আবার নারীরাও যেন অন্য নারীদের (উপহাস) না করে, এমনও তো হতে পারে, যাদের উপহাস করা হয় তারা উপহাসকারিণীদের চাইতে উত্তম। একজন (মুমিন) অপর (মুমিন) ভাইকে দোষারোপ করবে না। আবার একজন আর একজনকে খারাপ নাম ধরেও ডাকবে না। ঈমান আনার পর কাউকে খারাপ নামে ডাকা গুনাহর কাজ। যারা এ আচরণ থেকে ফিরে আসবে না তারা যালিম।

হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! তোমরা বেশি বেশি অনুমান করা থেকে বেঁচে থাক, কিছু কিছু অনুমান পাপ এবং একে অপরের পিছনে গোয়েন্দাগিরি করো না, একজন আর একজনের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? (আর অবশ্যই) তোমরা এটা অত্যন্ত ঘৃণা কর, এবং আল্লহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী এবং অত্যন্ত দয়ালু।'

(কুরআন, সূরা-৪৯, আয়াত-৯-১২)

"হে ঈমানদারগণ ! যখন জুমআর দিন (অর্থাৎ শুক্রবার) নামাযের জন্য আযান দেওয়া হবে, তখন আল্লাহর স্মরণের (অর্থাৎ নামাযের) জন্য তৎপর হও এবং (ক্রয় ও) বিক্রয় পরিত্যাগ কর। এ তোমাদের জন্য উত্তম--যদি তোমরা জান।"

(কুরআন, সূরা-৬২, আয়াত-৯)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের উপর রোযা ফরয (আবশ্যক) করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা খোদাভীরু হতে পার।" (কুরআন, সূরা-২, আয়াত-১৮৩)

"এবং কোন ব্যক্তি যদি পাপকার্য করে ফেলে কিংবা নিজের উপর অত্যাচার করে বসে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও অনুগ্রহশীল পাবে।" (কুরআন, সূরা-৪, আয়াত-১১০)

"যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল সব অবস্থায়ই (নিজেদের অর্থসম্পদ আল্লাহর পথে) ব্যয় করে, ক্রোধকে সংবরণ করে এবং লোকেদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেয়, এ ধরনের সৎলোকদের আল্লাহ বন্ধু বানিয়ে নেন (অর্থাৎ খুব ভালবাসেন)।"

(কুরআন, সূরা-৩, আয়াত-১৩৪)

"এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ করো না। (এমনটা করলে) তোমরা ভীতু হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রতিপ্রত্তি খর্ব হতে থাকবে। ধৈর্য্যের সাথে কাজে আঞ্জাম দাও, কেননা আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাহায্যকারী।" (কুরআন, সূরা-৮, আয়াত-৪৬)

ইসলামে নিহিত আদর্শ ন্যায় ও সুবিচার

ইসলামের ন্যায় নীতিপূর্ণ জীবন বিধান পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে।

ইসলামে শত্রুদের সঙ্গেও যথার্থ ন্যায় ও সুবিচার করার আদেশ ন্যায় ও সুবিচারের সর্বোচ্চ আদর্শ পেশ করে। নিম্নোক্ত আয়াতগুলি অনুধাবন করুন :

"হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহর জন্য ন্যায়বিচারের সাক্ষ্য দেওয়ার নিমিত্তে দন্ডায়মান হও এবং মানুষদের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এইভাবে তৈয়ার না করে যে, তোমরা ইনসাফ (ন্যায় বিচার) ত্যাগ করে দেবে। ন্যায় বিচার কর, কেননা এটাই পরহেজগারীতার বিষয় এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত।"(কুরআন, সূরা-৫, আয়াত-৮)

"হে ঈমানদারগণ ! ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দান কর। তাতে (এর ফলে) তোমাদের অথবা তোমাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষতি হলেও। যদি কেউ ধনী অথবা দরিদ্র হয়, তাহলে আল্লাহ তাদের জন্য শুভাকাঙ্খী। অতএব নিজেদের প্রবৃত্তির বাসনার অনুসরণ করে ইনসাফ (ন্যায়) করাকে ছেড়ে দিওনা। যদি তোমরা মন রাখা সাক্ষ্যদান কর, কিংবা (সাক্ষ্যদান) থেকে বিরত থাক, তাহলে (জেনে রাখ) আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত।" (কুরআন, সূরা-৪, আয়াত-১৩৫)

এই বদনাম করা হয় যে, ইসলামে অমুসলিমদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ কেবল অমুসলমানদের সঙ্গে নয়, বরং শত্রুদের সঙ্গেও বাড়াবাড়ি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। দেখুন :

"এবং যারা তোমাদের সাথে লড়াই করে, তোমরাও আল্লাহর রাস্তায় তাদের সাথে লড়াই কর, কিন্তু বাড়াবাড়ি (অর্থাৎ অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ) করো না। কেননা, সীমালঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না।" (কুরআন, সূরা-২, আয়াত-১৯০)

কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করার অনুমতি ইসলামে নেই। এমন কাজ যে করবে তার একটাই শাস্তি--রক্তের বদলে রক্ত। কিন্তু এই শাস্তি কেবল হত্যাকারীরই পাওয়া উচিত এবং এতে বাড়াবাড়ি করা নিষিদ্ধ। এটাকেই তো বলা হয় যথার্থ ন্যায় ও সুবিচার। নিম্নে উল্লেখিত আল্লাহর এই আদেশ লক্ষ্য করুন :

"এবং যে প্রাণ হত্যা করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন তাকে হত্যা করো না - কিন্তু সততা সহকারে (অর্থাৎ শরীয়তের ফাতাওয়া (হুকুম) অনুসারে)। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে, আমি তার উত্তরাধিকারীকে অধিকার প্রদান করেছি(যে, অত্যাচারী ঘাতকের প্রতি বদলা নেবে)। অতএব তার উচিৎ- হত্যার বদলা (কেসাস) গ্রহণ করার ক্ষেত্রে

সীমালঙ্ঘন না করা, সে অবশ্যই সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী হবে।"

(কুরআন, সূরা-১৭, আয়াত-৩৩)

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের জন্য নরহত্যার ব্যাপারে কিসাস (অর্থাৎ রক্তের বদলে রক্ত)-এর হুকুম প্রদান করা হয়েছে (এইভাবে যে,) স্বাধীন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তাকেই হত্যা করা হবে। ক্রীতদাস হত্যাকারী হলে বিনিময়ে তাকেই হত্যা করা হবে। কোন নারী এ অপরাধ করলে তাকে হত্যা করে 'কেসাস' নেয়া হবে। অবশ্য কোন হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছু নম্র ব্যবহার করতে প্রস্তুত হয়, তবে প্রচলিত ন্যায়-নীতি অনুযায়ী প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক এবং সততার সাথে রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দন্ড হ্রাস ও অনুগ্রহ মাত্র। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য রয়েছে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি।"

(কুরআন, সূরা-২, আয়াত-১৭৮)

"এবং হে বিবেকসম্পন্ন মানুষ ! কিসাসের (নির্দেশের) মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত। আশা করা যায় যে, তোমরা (হত্যা ও রক্তপাত) করা থেকে বিরত থাকবে।"

(কুরআন, সূরা-২, আয়াত-১৭৯)

"যদি কারুর অসীয়তকারীর তরফ থেকে (কোন উত্তরাধিকারীর) পক্ষপাতিত্ব কিংবা অধিকার নষ্ট করার আশঙ্কা হয়, তাহলে সে যদি (অসিয়ত বদল করে) উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, এতে কোন অপরাধ নেই। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।" (কুরআন, সূরা-২, আয়াত-১৮২)

"এবং যে চুরি করবে, পুরুষ হোক বা নারী, তাদের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কর্মের শাস্তি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত শিক্ষা। আল্লাহ পরাক্রমশালী (এবং) প্রজ্ঞাবান।" (কুরআন, সূরা-৫, আয়াত-৩৮)

"হে ঈমানদারগণ ! জোরপূর্বক স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের পক্ষে মোটেই বৈধ নয়। এবং যে 'মোহরানা' তোমরা তাদের দান করেছ তাদেরকে জ্বালা-যন্ত্রণা দিয়ে তার একাংশ হস্তগত করতে চেষ্টা করাও তোমাদের জন্য বৈধ নয়। কিন্তু তারা যদি কোন সুস্পষ্ট ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, (তবে তাদেরকে কষ্ট দেয়ার অধিকার অবশ্যই তোমাদের আছে), এবং তাদের সাথে মিলেমিশে জীবন যাপন কর। যদি তারা তোমাদের পছন্দমতো না হয়, তবে হতে পারে যে, কোন জিনিস তোমাদের পছন্দ নয়, কিন্তু আল্লাহ তাতেই তোমাদের জন্য অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।"

(কুরআন, সূরা-৪, আয়াত-১৯)

"যে সম্পদ পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজন রেখে মারা গেছে, কম হোক বা বেশি,

তাতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং নারীদেরও অংশ আছে। এই অংশ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দ্ধারিত।" (কুরআন, সূরা-৪, আয়াত-৭)

ইসলামের সর্বোত্তম ন্যায়পূর্ণ ব্যবস্থাপনার কারণেই ইসলামী রাষ্ট্রগুলিতে (যেখানে এই বিধান প্রচলিত) হত্যা, ডাকাতি, রাহাজানী, বলাৎকার, ব্যভিচার এবং চুরি ইত্যাদি নেই। বিশ্ববাসী নিতান্তই আশ্চর্য হয়ে দেখে যে, দুবাই, ইরান, ইরাক, সৌদী আরব, কুয়েত প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলিতে জুমআর আযান হওয়ার সাথে সাথেই দোকানদাররা নিজের নিজের দোকানগুলিতে কোটী কোটী টাকা মূল্যের কুইন্টাল কুইন্টাল সোনা ছেড়ে রেখে নামায পড়ার জন্য মসজিদে যান। দোকানগুলিতে কারুর না থাকার পরও কখনও কোন চুরি হয় না।

আজ গোটা দুনিয়ায় যুবসম্প্রদায়কে আফিম থেকে প্রস্তুত মাদকদ্রব্য ও ঔষধ সেবন করানো হচ্ছে। কিন্তু ইসলামি ন্যায় বিধান ও ব্যবস্থাপনারই শ্রেষ্ঠত্ব এটাই যে, ইসলামী ন্যায়বিধান লাগুকারী দেশগুলি এ ধরনের সামাজিক অপরাধ ও খারাবী থেকে মুক্ত।

ইসলাম বিশ্বের সর্বোচ্চ ব্যবহারিক মানবীয় আদর্শ

দেখুন কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত :

"তোমরা (কিবলা মনে করে) পূর্বদিকে মুখ করলে কি পশ্চিম দিকে তা কোন পূণ্যের বিষয় নয়। বরং পূণ্য হ'ল এই যে, মানুষ আল্লাহর উপর এবং ফেরেশতাদের উপর এবং আল্লাহর কিতাবের উপর এবং পয়গম্বরদের উপর ঈমান আনবে। আর সম্পদ প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও তা আত্মীয়-স্বজন, অনাথ, অভাবী, মুখাপেক্ষী, পথিক এবং সাহায্যপ্রার্থীদের জন্য খরচ করবে। আর গর্দান (মুক্ত) করার নিমিত্তে[৭] খরচ করবে। নামায পড়বে ও যাকাত দেবে এবং প্রতিশ্রুতি দান করলে তা পূরণ করবে। আর দরিদ্রতা, সংকীর্ণতা ও বিপদের সময় এবং (লড়াই)-এর ময়দানে অটল থাকবে। এইসব লোক হ'ল তারা, যারা (ঈমানের ক্ষেত্রে) সাচ্চা এবং এরাই হ'ল (আল্লাহর প্রতি) ভয় পোষণকারী।" (কুরআন, সুরা-২, আয়াত-১৭৭)

"এবং একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করোনা এবং এমনভাবে (উপঢৌকন স্বরূপ) তাকে শাসকের সমীপে পেশ করবে না, যাতে মানুষদের ধন-সম্পদের কিছু অংশ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করতে পার এবং (এটা) তোমরা জানতেও।

(কুরআন, সুরা-২, আয়াত-১৮৮)

"যদি তোমরা দান-খয়রাত প্রকাশ্যভাবে দাও, তবে তাও ভাল। আর যদি গোপনে অভাবী লোকদের দাও, তবে তা তোমাদের জন্য বেশী ভাল। আর (এরূপভাবে দান করা) তোমাদের পাপসমূহকেও দূর করে দেবে। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।" (কুরআন, সুরা-২, আয়াত-২৭১)

"আল্লাহ সূদকে ধ্বংসশীল (অর্থাৎ বরকতহীন) করে দেন এবং [অর্থাৎ দানকে] খয়রাতকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন এবং আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না।"

(কুরআন, সুরা-২, আয়াত-২৭৬)

"হে ঈমানদারগণ [অর্থাৎ মুসলমানগণ !] আল্লাহকে ভয় কর আর যদি ঈমানদার হয়ে থাক তাহলে যতটা সূদ পাওনা থেকে গেছে, তা ছেড়ে দাও।

যদি এমনটা না কর, তাহলে সাবধান হয়ে যাও (যে, তোমরা) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য (প্রস্তুত হয়ে গেছ) এবং যদি তওবা (অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত) করে নাও (এবং সূদ পরিত্যাগ কর) তাহলে তোমাদের নিজেদের মূলধন ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রয়েছে, যার মধ্যে না অন্যদের ক্ষতি আর না তোমাদের।

এবং যদি ঋণগ্রহণকারী (ব্যক্তি) অভাবগ্রস্ত হয়, তাহলে (তাকে) স্বচ্ছলতা (অর্জন করা) পর্যন্ত সময় দাও। আর যদি (ঋণের অর্থ) দান করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য

৭। এখানে 'গর্দান মুক্ত' করার অর্থ-- গোলামকে কিনে নিয়ে তাকে পুনরায় মুক্ত করে দেওয়া।

অধিক উত্তম যদি তোমরা তা বুঝতে পার।''

আর সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর সমীপে ফিরে আসবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেদের কার্যাবলীর পুরাপুরি প্রতিফল লাভ করবে এবং কারুর কিছু নষ্ট হবে না।'' (কুরআন, সুরা-২, আয়াত-২৭৮-২৮১)

''যদি অনাথদের সম্পদ (তোমাদের কাছে থাকে), তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও। আর তাদের পবিত্র (এবং উত্তম) মালের সঙ্গে (নিজেদের খারাপ ও) নিকৃষ্ট মালকে বদল করো না। তাদের মালকে নিজেদের মালের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আত্মসাৎ করো না। এ খুব কঠিন পাপের কাজ।'' (কুরআন, সুরা-৪, আয়াত-২)

''যে ব্যক্তি অনাথদের মাল অবৈধভাবে ভক্ষণ করে, সে নিজের উদরে আগুন ভর্তি করে এবং তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।'' (কুরআন, সুরা-৪, আয়াত-১০)

''এবং অনাথদের সম্পদের নিকটেও যেও না, তবে এমন পদ্ধতিতে যা খুবই পছন্দনীয়, যতদিন না সে যৌবনে পৌঁছে যায়। আর ওজন ন্যায়পূর্ণ ও ঠিক ঠিক দাও। আমি কাউকে কষ্ট দিই না, অবশ্য তার সামর্থ্য অনুযায়ী। এবং যখন (কারুর প্রসঙ্গে) কোন কথা বলবে তা ন্যায় পথে বল, তা সে নিজের আত্মীয়েরই ব্যাপার হলেও। এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর। এই কথাগুলির হুকুম আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।'' (কুরআন, সুরা-৬, আয়াত-১৫২)

''সাদকাগুলি (অর্থাৎ যাকাত ও দান) তো ফকীর ও মিসকীনদের জন্য আর তাদের জন্য যারা সাদকা সংক্রান্ত কাজ করে এবং তাদের জন্য যাদের মন জয় করা হ'ল উদ্দেশ্য। এবং দাস মুক্ত করার জন্য এবং ঋণগ্রস্তদের (ঋণ পরিশোধ করার জন্য) এবং আল্লাহর পথে ও পথিকদের (সাহায্যের) জন্যও (এই মাল খরচ করা উচিত)। (এই অধিকার সমূহ) আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং প্রজ্ঞাবান।'' (কুরআন, সুরা-৯, আয়াত-৬০)

''এবং অনাথদের সম্পদের কাছেও যেও না, কিন্তু অতি উত্তম পন্থায়, যতদিনে সে তার যৌবনে উপনীত হয়। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে কেননা প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে।

এবং যখন (কোন জিনিস) মেপে দেবে, তখন তা পরিপূর্ণ ভর্তি করে দেবে, আর যখন (ওজন করে দেবে, তখন) পাল্লা ত্রুটিহীন করে মাপ করবে। এ খুবই ভাল নীতি এবং পরিণামের দিক দিয়েও অতীব উত্তম।

এবং (হে বান্দা !) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছনে লেগে পড়ো না। কেননা--কান, চোখ এবং হৃদয় এইসব (অঙ্গ)-কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এবং যমীনের উপর বাহাদুরী দেখিয়ে চলাফেরা করো না। তোমরা যমীনকে না দীর্ণ করতে পারবে, আর না পর্বতের ন্যায় উচ্চতা লাভ করতে পারবে। এইসব (অভ্যাস)-এর

খারাপ দিক তোমার প্রতিপালকের নিকট খুবই অপছন্দনীয়।''

(কুরআন, সুরা-১৭, আয়াত-৩৪--৩৮)

''(হে পয়গম্বর !) বলে দাও ' হে লোকসকল ! আমি তোমাদের প্রকাশ্য নসীহতকারী (সতর্ককারী)।

সুতরাং যে লোক ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুযী।

এবং যে সব লোকেরা আমার আয়াত সমূহকে (ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে) হীন করার চেষ্টা করবে তারা দোযখবাসী হবে।'' (কুরআন, সুরা-২২, আয়াত-৪৯--৫১)

''(দেখো) ওজনের পরিমাপ পুরাপুরি ভরে দাও এবং কারুর ক্ষতি সাধন করো না। এবং পাল্লা সোজা রেখে ওজন করো।

লোকদেরকে তাদের মাল কম দিও না এবং যমীনে (দেশে) ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে বেড়াবে না। এবং তাঁকে ভয় করো, যিনি তোমাকে এবং পূর্বেকার (জীবিতদের)-কে সৃষ্টি করেছেন।'' (কুরআন, সুরা-২৬, আয়াত-১৮১-১৮৪)

''যারা বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করে এবং পরে দোষ প্রচারে অভ্যস্ত তাদের জন্য অকল্যাণ। যে ধন সঞ্চয় করে রাখে এবং তা গুনে গুনে রাখে এবং মনে করে যে, তার মাল তার চিরকালের জন্য উপকরণ হবে। কক্ষণই নয়, সে ব্যক্তিকে অবশ্যই হুতামাতে (চূর্ণ-বিচূর্ণকারী স্থানে) নিক্ষেপ করা হবে। আর তুমি কি জান সেই হুতামা কি ? এ হ'ল আল্লাহর উৎক্ষিপ্ত আগুন যা তাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাবে। (এবং) তাকে তার মধ্যে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হবে, অর্থাৎ (আগুনের) উঁচু উঁচু স্তম্ভের মধ্যে (পরিবেষ্টিত হবে)।

(কুরআন, সুরা-১০৪, আয়াত-১--৯)

''তুমি সেই ব্যক্তিকে কি দেখেছ যে প্রতিদান (দিবস)-কে অস্বীকার করে ? এতো সেই (হতভাগ্য) যে অনাথকে ধাক্কা দেয়, এবং দরিদ্রদের খেতে দিতে (লোকদেরকে) উৎসাহিত করে না। পরন্তু : সেই নামাযীর জন্য ধ্বংস, যে নামাযের ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। যে লোক দেখানো কাজ করে, আর সাধারণ প্রয়োজনের জিনিস সামগ্রী (ধার) দেয় না।'' (কুরআন, সুরা-১০৭, আয়াত-১--৭)

''বল : আমি আশ্রয় চাই সকালবেলার মালিকের নিকট সেই সব প্রত্যেক জিনিসের অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। আর রাত্রির অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এবং গিরায় (পড়ে পড়ে) ফুঁক দানকারীনির অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।'' (কুরআন, সুরা-১১৩, আয়াত-১--৫)

''বল : আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রভু, মানুষের বাদশাহ, মানুষের প্রকৃত মাবুদের নিকট। (শয়তানের) কু-প্ররোচনাদাতার অনিষ্ট থেকে যা (আল্লাহর নাম শুনে) পিছনে সরে যায়। যে লোকেদের অন্তরে কু-প্ররোচনার উদ্রেক করে, (তা সে) জ্বিনের মধ্যে হোক কিংবা মানুষের মধ্য থেকে।'' (কুরআন, সূরা-১১৪, আয়াত-১--৬)

পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.)-এর বাণী

পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী, তাঁর কথা ও কার্যাবলী এবং কুরআন মজীদে আল্লাহর আদেশাবলীরই নাম হ'ল ইসলাম।

আমরা কুরআন মজীদে ব্যক্ত আল্লাহর কিছু বাণী দেখে নিয়েছি। হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনী অবগত হয়েছি। এখন আল্লাহর রাসূল (স)-এর কথন (হাদীস) দেখুন:

হাদীসের সমস্ত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সবচেয়ে মহত্বপূর্ণ গ্রন্থ হ'ল 'বুখারী শরীফ' এবং 'মুসলিম শরীফ'। নিম্নে যে হাদীসগুলি পেশ করা হ'ল তা উক্ত দুই গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে ঃ

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর পয়গম্বর (স) বলেছেন, "নিজের ভাইকে সাহায্য কর, তা সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত।"

(তাঁকে) নিবেদন করা হ'ল। "হে আল্লাহর পয়গম্বর ! অত্যাচারিত হলে তো আমরা তাকে সাহায্য করতে পারি, কিন্তু অত্যাচারী হলে কিভাবে সাহায্য করব ?"

(পয়গম্বর) বললেন, "তার হাত পাকড়ে ধর (অত্যাচার করতে দিও না)।"

(বুখারী শরীফ, হাদীস-১০৪৬)

হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেছেন- "যে ব্যক্তি রহম (অর্থাৎ দয়া) করে না, তার উপর রহম করা হয় না।"

(বুখারী শরীফ, হাদীস-১৬৭৪)

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বলেন, হযরত মুহাম্মাদ (স.) না ছিলেন লজ্জাহীন, আর না ছিলেন গালিগালাজকারী, না কারুর উপর অভিশম্পাত দানকারী ছিলেন, বরং যখন তিনি কারও উপর ক্রোধান্বিত হতেন, তখন এভাবে বলতেন, 'এ কি হয়ে গেল? ওর মাথায় ছাইভস্ম পড়ুক।' (বুখারী শরীফ, হাদীস-১৬৮১)।

হযরত ইবনে উমার (রা.) বলেন, আল্লাহর পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (স.) বলেছেন, 'যদি কোনও মুসলমান অবৈধভাবে কারুর রক্তপাত না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার দ্বীন (ধর্ম) প্রসারিত এবং অগ্রবর্তী হতে থাকবে।' (বুখারী শরীফ, হাদীস-১৬৯৩)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন যে, আল্লাহর পয়গম্বর (স.) বলেছেন-- সমস্ত সজীব সত্তার মধ্যে আল্লাহতায়ালা তিন ব্যক্তিকে খারাপ মনে করেন--

১) যে নিষিদ্ধ এলাকায় (মুলকে হারাম) অত্যাচার করে, ২) ইসলামের মধ্যে জাহেলিয়াতের পদ্ধতির প্রচলনকারী, ৩) অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিতকারী।'

(বুখারী শরীফ, হাদীস নং. ১৬৯৭)।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন যে, আল্লাহর পয়গম্বর (স.) বলেছেন, 'শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে এমারত (নেতৃত্বের পদ লাভ) করার লালসা সৃষ্টি হবে কিন্তু এটা কিয়ামতের দিন পস্তানোর কারণ হবে। এর সূচনা তো ভালোই মনে হবে, কিন্তু পরিণতি হবে মন্দ।' (বুখারী শরীফ, হাদীস-১৭২৫)।

হযরত মা-কাল বিন ইয়াসার (রা.) বলেন, আল্লাহর পয়গম্বর (স.) বলেছেন, 'যে শাসক নিজের প্রজাদের অমঙ্গল কামনাকারী হয়ে মারা যাবে, আল্লাহতায়ালা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।' (বুখারী শরীফ, হাদীস-১৭২৭)

হযরত আবুবকর (রা.) বলেন যে, আল্লাহর পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (স.) বলেছেন, 'বিচারকের উচিৎ রাগান্বিত অবস্থায় কোনও সিদ্ধান্ত পেশ না করা।'

(বুখারী শরীফ, হাদীস-১৭২৯)

হযরত আয়েশাহ (রা.) বলেন, আল্লাহর পয়গম্বর (স.) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লহতায়ালার নিকট সবচেয়ে বেশি খারাপ মানুষ হল ঐ ব্যক্তি যে সর্বদা লড়াই ঝগড়া করতে থাকে।' (বুখারী শরীফ, হাদীস-১৭৩০)

হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আল্লাহর পয়গম্বর (স.) বলেছেন-- 'যখন তোমরা তিনজন ব্যক্তি হবে, তখন দুইজন ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে কানাঘুসো করবে না, যতক্ষণ অন্য (এক)জন সঙ্গে না আসে। কেননা, এই কানাঘুসো তৃতীয় ব্যক্তিকে ব্যথিত করে।' (বুখারী শরীফ, হাদীস-১৭৩৭)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর পয়গম্বর (স.)কে জিজ্ঞাসা করল-- 'কোন্ ইসলাম উত্তম?' পয়গম্বর বললেন, 'মানুষদের খাদ্য খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত উভয়কে সালাম করা।' (বুখারী শরীফ, হাদীস-১৮০৪)।

এক ব্যক্তি পয়গম্বর মুহাম্মাদ (স.)-কে বলল, 'কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তাদের অভিশম্পাত করুন।' এর জবাবে হুজুর (স.) বললেন, 'আমাকে পৃথিবীতে দয়া করার জন্য পাঠানো হয়েছে। অভিশম্পাত করার জন্য নয়।' (মুসলিম)।

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে বর্ণিত পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর কার্যাবলী এবং কথন (অর্থাৎ হাদীস) থেকে মুহাম্মাদ (স.)-এর জীবনী থেকে এবং কুরআন মজীদে উদ্ধৃত আল্লাহর বাণী সমূহের বিস্তৃত অধ্যয়ন থেকে পাঠকগণ স্বতঃই দেখতে পারেন যে, ইসলাম শান্তি, দয়া ও মানবতার সর্বোচ্চ ব্যবহারিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করেছে।

পৃথিবীতে কেবলমাত্র কুরআন মজীদেই ঐশী (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক) সত্যতার সাথে সাথে ব্যবহারিক সত্যতাও নিহীত। এই বিশেষত্বের জন্যই মক্কাতে ইসলামের উত্থান হয়েছে, সারা বিশ্বে পরিব্যপ্ত হয়েছে।

এরপরও যদি কেউ কুরআন মজীদে আল্লাহর এইসব আদেশাবলীর ভুল কিংবা মনগড়া অর্থ উদ্ভাবন করে তাহলে এজন্য কুরআন মজীদ বা ইসলাম দায়বদ্ধ নয়।

এইসঙ্গে পাঠকগণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন যে, সলমান রুশদী, আনওয়ার শেখ এবং তসলিমা নাসরিনদের মতো লেখকরা তাদের ভ্রান্ত পূর্ব ধারণায় প্রভাবিত হয়ে কুরআন মজীদের আয়াতগুলিকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

এ থেকে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের কোথাও সন্ত্রাসের আদেশ নেই। বরং ইসলাম সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। আর জিহাদ সন্ত্রাসের জন্য নয়, বরং আত্মরক্ষার জন্য, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এক প্রচেষ্টা।

যেমনটা আমি আমার পুস্তক 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস'-এ হিন্দু রাজাদের ও মুসলমান বাদশাহদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে খুন-খারাবীর বিষয় উল্লেখ করেছিলাম, সে বিষয়ে এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই খুন-খারাবী ছিল যুদ্ধের জন্য, ব্যক্তি বিশেষের জন্য ছিল, ইসলামের জন্য নয়, যুদ্ধে এমন খুন-খারাবী (রক্তপাত ইত্যাদি) প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে সর্বদা হতে থাকে। যেমন ইতিহাসে আলেকজান্ডার থেকে শুরু করে হিটলার পর্যন্ত সবাই এমনটা করে এসেছে। আমাদের দেশ ভারতে অশোকের কলিঙ্গ বিজয় অভিযানে এক লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল। তাঁর এই সন্ত্রাসমূলক কাজের জন্য তাঁর ধর্ম দোষী নয়। তেমনিভাবে মুসলিম বাদশাহদের ক্ষেত্রেও এমনটাই প্রযোজ্য।

এরপরও যদি কেউ কুরআন মজীদে আল্লাহর এইসব আদেশাবলীর ভুল কিংবা মনগড়া অর্থ উদ্ভাবন করে তাহলে এজন্য কুরআন মজীদ বা ইসলাম দায়বদ্ধ নয়।

এইসঙ্গে পাঠকগণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন যে, সলমান রুশদী, আনওয়ার শেখ এবং তসলিমা নাসরিনদের মতো লেখকরা তাদের ভ্রান্ত পূর্ব ধারণায় প্রভাবিত হয়ে কুরআন মজীদের আয়াতগুলিকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে।

এ থেকে স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের কোথাও সন্ত্রাসের আদেশ নেই। বরং ইসলাম সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। আর জিহাদ সন্ত্রাসের জন্য নয়, বরং আত্মরক্ষার জন্য, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে এক প্রচেষ্টা।

যেমনটা আমি আমার পুস্তক 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস'-এ হিন্দু রাজাদের ও মুসলমান বাদশাহদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে খুন-খারাবীর বিষয় উল্লেখ করেছিলাম, সে বিষয়ে এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই খুন-খারাবী ছিল যুদ্ধের জন্য, ব্যক্তি বিশেষের জন্য ছিল, ইসলামের জন্য নয়, যুদ্ধে এমন খুন-খারাবী (রক্তপাত ইত্যাদি) প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে সর্বদা হতে থাকে। যেমন ইতিহাসে আলেকজান্ডার থেকে শুরু করে হিটলার পর্যন্ত সবাই এমনটা করে এসেছে। আমাদের দেশ ভারতে অশোকের কলিঙ্গ বিজয় অভিযানে এক লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল। তাঁর এই সন্ত্রাসমূলক কাজের জন্য তাঁর ধর্ম দোষী নয়। তেমনিভাবে মুসলিম বাদশাহদের ক্ষেত্রেও এমনটাই প্রযোজ্য।

সনাতন বৈদিক ধর্ম এবং ইসলাম

একেশ্বরবাদী সত্যধর্ম ইসলাম শাশ্বত (সনাতন), ইসলাম এই পৃথিবীতে চিরকাল ছিল

কতিপয় হিন্দু ভাই ভ্রমবশতঃ এই মনে করে যে, ইসলাম আরব থেকে আগত ধর্ম যা হিন্দু বিরোধী। পূর্বে আমিও এমনটা বুঝতাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে জানার পর আমি জানতে পারলাম যে, ইসলাম না আরব থেকে এসেছে, আর না কেবল আরববাসীদের জন্য এসেছে। এ পরমেশ্বরের পক্ষ থেকে আগত ধর্ম, যা কেবল মুসলমাদের জন্য নয় বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য এসেছে। কুরআন মজীদের সূরা-২, আয়াত-১৮৫-তে উল্লেখ হয়েছে, 'কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মানুষদের সোজা রাস্তা দেখানোর জন্য।' এখানে 'মানুষদের' শব্দ এসেছে। মুসলমান কিংবা আরববাসী শব্দ আসেনি। এ রকমই সূরা-২৫-এ ১ নং আয়াতে আছেঃ 'বড়ই প্রাচুর্যময় (বরকতওয়ালা) তিনি যিনি এই 'ফুরকান' (অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী এই গ্রন্থ কুরআন) নিজের বান্দার উপর অবতীর্ণ করেছেন, যেন তা সারা জগৎবাসীর জন্য হেদোয়াতকারী (অর্থাৎ সঠিক পথ প্রদর্শক) হয়।'

এ হিন্দুদের বিরোধীও নয়, কেননা ইসলাম কোনও ব্যক্তি অথবা কোনও সম্প্রদায় কিংবা কোনও ধর্মের বিরোধিতা করে না। ইসলাম কেবল ভ্রান্ত কথা এবং অন্যায়ের বিরোধিতা করে এবং এই বিরোধিতা কেবলমাত্র মৌলিক নীতিমূলক। এজন্য কোনও প্রকারের জোর-জবরদস্তি নেই। কুরআন মজীদের সূরা-২, আয়াত ২৫৬-তে আল্লাহর আদেশ হল-- 'দ্বীন ইসলামে জোর-জবরদস্তি নেই।' সূরা-১০৯, আয়াত ৬-তে আছে, 'তুমি তোমার দ্বীন (ধর্ম)-এর উপর, আমি আমার দ্বীনের উপর।'

আমি দেখেছি যে, ইসলাম প্রসঙ্গে হিন্দুদের এবং সনাতন ধর্মের প্রসঙ্গে মুসলমানদের সঠিক অবগতি না থাকার কারণে নিজ নিজ ধর্মকে একে অপরের বিপরীত মনে করার মতো ভুল করে বসে, অথচ বাস্তব হ'ল এই যে, ইসলামের সবচেয়ে নিকটবর্তী যদি কোনও ধর্ম হয় তবে তা হ'ল 'সনাতন বৈদিক ধর্ম'। বৈদিক সনাতন ধর্মকে এখনকার হিন্দুধর্ম মনে করে পাঠকরা যেন ভুল না করেন। কেননা হিন্দু নামের কোনও ধর্ম নেই। এতো জীবনযাপনের এক পদ্ধতি মাত্র। হিন্দুদের প্রকৃত ধর্মের নাম সনাতন বৈদিক ধর্ম, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লিখতে হচ্ছে যে, অধিকাংশ হিন্দু নিজেদের প্রকৃত ধর্ম অর্থাৎ সনাতন বৈদিক ধর্মকে প্রায় ভুলে গিয়ে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

ভারতে প্রায় ৭৫ কোটি হিন্দু এবং ২৫ কোটি মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করে। যদি আমরা একে অপরের ধর্মকে, একে অপরের চিন্তাধারাকে না জানি তাহলে মানবতা বিরোধী তত্ত্ব, সমাজ বিরোধী তত্ত্ব অনায়াসে আমাদের মধ্যে ভ্রান্তি, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস সৃষ্টি করে দেবে। যেমনটা আজকাল হচ্ছে। এই দেশের জন্য এটা সব থেকে বড় সমস্যা।

এইজন্য এটা আবশ্যক যে, মুসলমান ভাইদের ধর্মকে হিন্দু ভাইরা জানুক এবং সনাতন বৈদিক ধর্ম অর্থাৎ বেদ, উপনিষদ এবং গীতাকে মুসলমান ভাইরা জানুক। যেন ধর্মের নামে কেউই আমাদের মাঝে ভ্রান্তি অর্থাৎ ভুল বোঝাবুঝির পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে। এটা একটা হিকমত (প্রজ্ঞা বা তত্ত্বপূর্ণ কথা)। এই হিকমতের মাধ্যমে সত্য সামনে আসবে। ভ্রান্তি এবং সন্দেহ দূর হবে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে একে অপরের প্রতি আস্থা বাড়বে। সত্যের প্রতিও বিশ্বাস বাড়বে এবং এই বিশ্বাস ও আস্থা ভবিষ্যতে মানুষদের জন্য এক নতুন রাস্তা খুলে দেবে। এ হিকমত (তত্ত্বপূর্ণ শিক্ষা) কুরআনেরও: -- 'এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান। তা এই যে, আমরা আল্লাহ অর্থাৎ পরমেশ্বর ছাড়া আর কারও বন্দনা করব না।' (৩:৬৪)। এই হিকমত (তত্ত্বপূর্ণ শিক্ষা) অনুসারে আমরা দেখব সনাতন বৈদিক ধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে কি অসাধারণ সামঞ্জস্য রয়েছে।

সনাতন বৈদিক ধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে আশ্চর্যজনক সাযুজ্যতা

প্রকৃত ইসলামকে জানার জন্য যখন আমি পুনরায় কুরআন পড়লাম তখন দেখলাম যে, এ হল ঐ সত্য যা হাজার হাজার বছর থেকে আমাদের বেদ, উপনিষদ এবং গীতাতে নিহিত রয়েছে। এইভাবে আমি ইসলামের মধ্যে আমার নিজস্বতাকে পেয়েছি। যেমন, কুরআনের প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম' অর্থাৎ 'শুরু করছি পরমেশ্বরের নামে যিনি বড়ই কৃপাবান এবং অত্যন্ত দয়ালু' পড়ার সাথে সাথেই আমার ওঁম শব্দ স্মরণে আসে, যার শাব্দিক অর্থ হল 'পরম কল্যাণকারী পরমেশ্বর'। বৈদিক মন্ত্রের শুরু হয় 'ওঁম' দিয়ে। যখন কোনও মন্ত্রের শুরুতে ওঁম লাগানো হয় তখন তার ভাবার্থ হয়ে যায় 'শুরু পরম কল্যাণকারী পরমেশ্বরের নামে' অথবা 'শুরু পরমেশ্বরের নামে, যিনি বড়ই কৃপাবান ও অত্যন্ত দয়ালু।' এটাই তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।'

ইসলামের বুনিয়াদ হল শিরক-বিরোধী অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ অর্থাৎ পরমেশ্বর ব্যতীত কেউই উপাসনার যোগ্য নয়)। সনাতন বৈদিক ধর্মের বুনিয়াদও এটাই।

জগতে সবথেকে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মওজুদ রয়েছে। ঋগ্বেদ মণ্ডল-১, সুক্ত-৭-এর ১০ম মন্ত্রে রয়েছে:

इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः।
अस्माकमस्तु केवलः ॥
(ऋग्वेदः मण्डल-१, सूक्त-७, मंत्र-१०)

ভাবার্থঃ হে মানুষ সকল! তোমাদের নিতান্তই উচিত যে, আমাকে ব্যতীত উপাসনা করার যোগ্য অন্য কোনও দেবতাকে কখনোও মনে করবে না। কেননা একমাত্র আমি ছাড়া অন্য কোনও ঈশ্বর নেই। (মহর্ষি দয়ানন্দের হিন্দী ভাষ্য থেকে[৮])

এই ভাবার্থের সংক্ষিপ্ত রূপ হল 'পরমেশ্বর ব্যতীত কোনও পূজ্য নেই।' আর এটাই হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'

৮। বেদ এক পূর্ণ একেশ্বরবাদী ঐশী গ্রন্থ। বেদের ভাষা বৈদিক সংস্কৃত ব্যাকরণ বহির্ভূত। সুতরাং মানুষরা বেদের মন্ত্রের অর্থ মনগড়া ভাবে বিকৃত করে দেয়।

স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী বৈদিক সংস্কৃতের বিশাল বিদ্বান ছিলেন এবং একজন একেশ্বরবাদী ধর্মাচার্য ছিলেন। তিনি কেবল বেদের উপরই বিশ্বাস করতেন এবং বেদের আদেশাবলীকেই সর্বোচ্চ ভাবে জানতেন। সুতরাং এই পুস্তকে উদ্ধৃত বেদ মন্ত্রগুলির

গীতাতে উল্লেখ রয়েছে:

মত্ত: পরতরং নান্যৎকিংচিদস্তি ধনঞ্জয়ঃ।

(গীতাল অধ্যায়-৭, শ্লোক-৭)

'হে ধনঞ্জয়! আমি (পরমেশ্বর) ছাড়া অন্য কোনও ঈশ্বর নেই।' (গীতা: অধ্যায়-৭, শ্লোক-৭)।

এখানে এই কথা বলা আবশ্যক যে, শ্রীমদভাগবত গীতায় পরমেশ্বরের সুসংবাদ রয়েছে। এই সুসংবাদ দানকারী শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন এক মহান যোগী।[৯] এইজন্য তাঁকে যোগেশ্বর বলা হয়েছে, পরমেশ্বরের সুসংবাদ পাওয়ার জন্য তিনি যে কোনও অবস্থায় পরমেশ্বরের সঙ্গে যোগ অর্থাৎ সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁর সুসংবাদ লাভ করতে পারতেন।

ইসলাম অনুযায়ী আল্লাহ্ অর্থাৎ পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা বা বন্দনা করা শিরক। ইসলাম একে সব থেকে বড় পাপ বলে মনে করে। সনাতন বৈদিক ধর্মও এই শিরককে ততটাই পাপ বলে মনে করে যতটা ইসলাম মনে করে।

শ্রীমদভাগবদ গীতার অধ্যায়-৭, শ্লোক-২০তে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পরমেশ্বরের সুসংবাদ দিতে গিয়ে বলেন:

কামৈস্তৈস্তৈ ঈতজ্ঞানাঃ প্রপধ্যন্তে ঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥

অর্থাৎ, 'এইসব ভোগের বাসনায় যার জ্ঞান হরণ করা হয়েছে (সে লোক) নিজের স্বভাববশত: ওইসব নিয়মনীতিকে ধারণ করে অন্য দেবতাদের পূজা করে।'

এর ভাবার্থ হল: ভোগ-বিলাস, আয়াশ ও আরামের পার্থিব বস্তুসমূহ, ধনসামগ্রী

হিন্দী ভাবার্থ আমি স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী দ্বারা কৃত বেদগুলির হিন্দী ভাষ্য থেকে নিয়েছি, কেননা এটাই শুদ্ধ।

শ্রী স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতীরই হিন্দী ভাষ্য গ্রহণ করার অন্য আর এক কারণ এটাও যে, যেমনটা আমি এই পুস্তকে পূর্বে উল্লেখ করেছি, স্বামীজী নিজের পুস্তক 'সত্যার্থ প্রকাশ'-এ ইসলাম প্রসঙ্গে যা লিখেছিলেন তাতে বহু মানুষ ইসলাম প্রসঙ্গে বিভ্রান্ত হয়ে থাকবেন। এজন্য আমি বৈদিক মন্ত্রগুলির ভাবার্থ এটাই গ্রহণ করেছি যা বৈদিক ধর্মের মহা বিদ্বান শ্রী স্বামী দয়ানন্দ স্বরস্বতী লিখেছেন। যাতে সত্যর্থ প্রকাশ পাঠ করে বিভ্রান্ত মানুষরা স্বামীজিরই ভাষ্য থেকে সত্যতা বুঝতে পারেন।

৯। পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার কর্মপদ্ধতিকে 'যোগ' বলে এবং এই যোগের মাধ্যমে পরমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম ব্যক্তিকে 'যোগী' বলা হয়।

পাওয়ার ইচ্ছার জন্য যার বিবেক শেষ হয়ে গেছে (সে লোক) সেইসব পাবার ইচ্ছায় (অর্থাৎ লালচে প্রভাবিত হয়ে) ভিন্ন ভিন্ন দেবতাদের পূজা ভিন্ন ভিন্ন বিধি অনুযায়ী করে।

গীতারই অধ্যায়-৭, শ্লোক-২৩ নং বলা হয়েছে:

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्।
दावान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामणि॥

ভাবার্থ: কিন্তু পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য দেবতাদের পূজাকারী ঐ সব অবুঝদের ঐ সব ফল (অর্থাৎ ঐ সব ভৌত বস্তু অর্থাৎ ঐ সব পার্থিব জীবনের সামগ্রী) কয়েক দিনের জন্য (এবং ঐ সব) দেবতাদের পূজক দেবতাদের প্রাপ্ত হয়। এবং আমি পরমেশ্বর, আমার ভক্ত (অর্থাৎ যে নিজে নিজেকে আমার উপর সোপর্দ করে দেয়) আমারই প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ আমার ভুবনে পৌঁছে যায়। অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে (অর্থাৎ জান্নাতে পৌঁছে যায়)।

तमेव शरणं गच्छ सर्व भावते भारत।
तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्रप्स्यसि शाश्वतम् ।।

গীতা: অধ্যায়-১৮, শ্লোক-৬২)

(এইজন্য) হে অর্জুন! (তুমি) সর্বপ্রকারে ঐ পরমেশ্বরেরই আশ্রয়ে যাও। ঐ পরমেশ্বরের কৃপায় (মাধ্যমেই তুমি) পরম শান্তির (এবং) শাশ্বত পরম স্থান অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হবে। গীতা: অধ্যায়-১৮, সংস্কৃত শ্লোক-৬২।

ইসলামে নামায হল-- কেবলমাত্র এক পরমেশ্বরেরই অকৃত্রিম নিষ্কাম ভাবসম্পন্ন উপাসনা। ভোগবিলাসের পার্থিব বস্তু, ধন সামগ্রীর কামনার জন্য পরমেশ্বরের সকাম উপাসনা কিংবা অন্যান্য দেবতাদের উপাসনা ইসলামে আদৌ নেই। এজন্য গীতা অনুসারে উপাসনাকারী মুসলমান কেবলমাত্র মুক্তি অর্থাৎ মোক্ষই লাভ করে।

কুরআনের সুরা-১০, আয়াত-১০৬-তে উল্লেখ রয়েছে:

'এবং আল্লাহকে ছেড়ে এমন কোনও সত্তাকে ডেকো না, যে না তোমার কোন কল্যাণ করতে পারে, আর না কোনও ক্ষতি করতে পারে। যদি এরূপ কর, তাহলে তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে।'

সূরা-৩, আয়াত-১৪-তে আল্লাহ বলেছেন:

'লোকেদের তাদের আকাঙ্খিত (অর্থাৎ মনঃপুত) জিনিসসমূহ যেমন-- নারী, সন্তান, স্বর্ণরৌপ্যের বড় বড় স্তুপ, বাছাই করা ঘোড়া, গৃহপালিত পশু ও কৃষিজমি বড়ই সৌন্দর্য্যময় (অর্থাৎ বড়ই মনোরম) মনে হয়, (কিন্তু) এসব দুনিয়ারই জীবনের সামগ্রী এবং আল্লাহর কাছে রয়েছে খুব ভালো আশ্রয় (ঠিকানা)।'

সূরা-৩, আয়াত-১৫-তে উল্লেখ রয়েছে:

'(হে পয়গম্বর! ওদেরকে) বল, আমি কি তোমাদের বলব এ সবের অপেক্ষা অধিক ভালো জিনিস কোনটি? (শোন) যারা পরহেযগার (খোদাভীরু), তাদের জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে (বেহেশতের) অর্থাৎ জান্নাতের বাগিচা, যার পাদদেশ হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে এবং সেখানে রয়েছে পবিত্রা নারীগণ এবং (সবচেয়ে বড় কথা) আল্লাহর খুশনুদী অর্থাৎ সন্তোষ এবং আল্লাহ (তাঁর সৎ) বান্দাদের দেখছেন।'

সূরা-৩, আয়াত-১৬ ও ১৭তে উল্লেখ রয়েছে:

'যারা আল্লাহর কাছে বলে (অর্থাৎ প্রার্থনা) করে-- হে প্রভু, আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও এবং দোযখের শাস্তি (অর্থাৎ নরকের আগুন) থেকে রক্ষা কর।

এরা ওইসব লোক যারা (বিপদে) ধৈর্য্যধারণ করে, সত্য কথা বলে এবং ইবাদতে (উপাসনায়) মশগুল থাকে এবং (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে এবং রাত্রের অন্তিম সময়ে নিজেদের পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।'

সূরা-১৮, আয়াত ৪৬তে রয়েছে:

'ধন-সম্পদ এবং সন্তান তো কেবলমাত্র পার্থিব জীবনের (চাকচিক্য এবং) সৌন্দর্য্য। এবং টিকে থাকা পূণ্যকর্ম সওয়াব (পুরস্কার)-এর দিক দিয়ে তোমার প্রভুর কাছে নিতান্তই ভালো এবং আশা পোষণ করার দিক দিয়ে অতি উত্তম।'

ইসলাম অনুসারে আল্লাহই (অর্থাৎ পরমেশ্বরই) বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি পালনকর্তা এবং তিনিই মহাপ্রলয়কারী।

এইকথা বেদও বলে। ঋগ্বেদে রয়েছে:

परि धामानि यानि ते त्वं सोमासि विश्वत:।
पवमान ऋतुभि: कवे॥
(ऋग्वेद: मण्डल-९, सुक्त-६६, मंत्र-३)

ভাবার্থ: পরমাত্মা উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় (অর্থাৎ কিয়ামত) এই তিন প্রকার কার্যক্রমের কারণ। অর্থাৎ তাঁর থেকেই জগৎ সংসারের উৎপত্তি, তাতেই স্থিতি এবং তাঁর থেকেই বিনাশ হয়। (ঋগ্বেদ: মণ্ডল-৯, সুক্ত-৬৬, মন্ত্র-৩) (হিন্দী ভাষ্য মহর্ষি দয়ানন্দ থেকে)।

त्वं धां च महिव्रत पृथिवीं चाति उभ्रिषे।
प्रति द्रापिममुत्वथा: पवमान महित्वना॥
(ऋग्वेद: मण्डल-९, सुक्त-१००, मंत्र-९)

ভাবার্থ: পরমেশ্বর স্বর্গলোক এবং পৃথিবীকে ঐশ্বর্যশালীরূপে সৃষ্টি করে তাকে নিজের

রক্ষাকবচে আচ্ছাদিত করেছেন। এমনই বিচিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে এই অনন্ত বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন যে তার মহত্ব কেউ অর্জন করতে পারে না। (হিন্দী ভাষ্য মহর্ষি দয়ানন্দ থেকে)। (ঋগ্বেদ: মণ্ডল-৯, সুক্ত ১০০, মন্ত্র-৯)

यो: न पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्व।
यो देवानां नामधा एक एव सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या॥
(ऋग्वेद: मण्डल-१०, सुक्त-८२, मंत्र-३)

ভাবার্থ: যে পরমেশ্বর আমাদের প্রতিপালক, আমাদের সৃষ্টিকর্তা, যিনি সমগ্র জগতের নির্মাতা ও সর্বস্থান, সর্বলোক এবং পদার্থকে জানেন এবং যিনি সমস্ত পদার্থের নাম রেখেছেন তিনি অদ্বিতীয় (অর্থাৎ তাঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই)। সমস্ত সমস্যার তিনিই একমাত্র সমাধান, (হিন্দী ভাষ্য মহর্ষি দয়ানন্দ থেকে)। (ঋগ্বেদ: মণ্ডল-১০, সুক্ত-৮২, মন্ত্র-৩)

গীতা: অধ্যায় ৭ ও শ্লোক ৬-তে রয়েছে:

अहं कृत्स्नस्य जगत: प्रभव: प्रलयस्तथा।

যজুর্বেদে আছে:

अपां पृष्ठमसि योनिरग्ने: समुद्रमभित: पिन्वमानम्।
वर्धमानो महाँऽआ च पुष्करे दिवी मात्रया वरिम्णा प्रथस्व॥
(यजुर्वेद: तेरहवाँ अध्याय, मंत्र-२)

ভাবার্থ: আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি এবং ধ্বংস (এর মূল কারণ)।

ভাবার্থ: মানুষ যে শক্তিমত্তা, চিত্ত এবং আনন্দময়তা, সমগ্র জগতের রচনাকারী, সর্বব্যাপক, সর্বোত্তম এবং সর্বশক্তিমান ব্রহ্মার উপাসনার মাধ্যমে পূর্ণ জ্ঞানী অসীম গুণের অধিকারী হয়ে থাকে তার প্রয়োগ (সেবন) কেন করা উচিত নয়? (হিন্দী ভাষ্য মহর্ষি দয়ানন্দ থেকে)।

ইসলাম অনুসারে এক এবং একমাত্র আল্লাহ (অর্থাৎ পরমেশ্বর) যিনি জাত নন, অবিনাশী, নিরাকার এবং সর্বশক্তিমান, তিনি না জন্ম নেন আর না মৃত্যুবরণও করেন।

বেদও এই কথা বলে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ অধ্যায়-৬, শ্লোক ৮-তে রয়েছে।

न तस्य कार्यं करणं च विधते।

ভাবার্থ: এই (পরমেশ্বরের) দেহ এবং ইন্দ্রিয়সমূহ নেই অর্থাৎ তিনি নিরাকার। (তিনি ভক্ষণ, পান করা অথবা কোনও প্রকার বাসনা অথবা আবশ্যকতা থেকে পবিত্র।)

কেনোপনিষদ খণ্ড-১, শ্লোক-৬-তে রয়েছে:

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूँषि पश्यति

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥

ভাবার্থ: যাকে কেউ চোখে দেখে না, বরং যার সহায়তায় চোখ দেখে, তাকেই তুমি ঈশ্বর জ্ঞান কর। চোখে দৃশ্যমান সমস্ত (পৃথক পৃথক) যেসব তত্ত্বাবলীকে বা বস্তুসমূহকে ঈশ্বর মনে করে মানুষ উপাসনা করে, তা ঈশ্বর নয়।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ অধ্যায়-৬, শ্লোক-৯তে রয়েছে:

न तस्य कश्चित्यतिरस्ति लोके
न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्।
स कारणं करणाधिपाधिपी
न चास्य कशिचज्जनिङ्क्ता न चाधिपः॥

ভাবার্থ: ব্রহ্মাণ্ডে তার কোনও প্রভু নেই, না কোনও শাসক অথবা তার চিহ্নও। তিনি সমগ্র জীব জগতের সৃষ্টিকারী এবং তার মনিব। তাঁর সৃষ্টিকারী অন্য কোনও প্রভু নেই।

ইসলামের বিশ্বখ্যাত শ্লোগান 'আল্লাহু আকবর'। (অর্থাৎ আল্লাহ সবার বড়, অথবা আল্লাহ সবচেয়ে মহান) এক পূর্ণ সত্য, সার্বভৌমিক সত্য। এই সত্য তখনও ছিল যখন দুনিয়া ছিল না, আজও সত্য এবং তখনও সত্য থাকবে যখন মহাপ্রলয় (অর্থাৎ কিয়ামত)-এর পর দুনিয়া থাকবে না। সনাতন বৈদিক ধর্মের মূল কথাও এই।

पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमिवावशिष्यते।

(পরমেশ্বর বহু বড়, এত বড় যে) তাঁর পূর্ণতা থেকে পূর্ণতা দূর করে দিলেও পূর্ণতাই অবশিষ্ট থাকে। (অর্থাৎ আল্লাহ অনন্ত, কেননা কেবলমাত্র অনন্ত থেকেই অনন্তকে বের করে দিলেও অনন্তই অবশিষ্ট থাকে।)

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ অধ্যায়-৬, শ্লোক ৮-তে আল্লাহু আকবর :

न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।

ভাবার্থ : এই (পরমেশ্বরের) সমান এবং তাঁর থেকে বড় আর অন্য কিছু দেখা যায় না অর্থাৎ পরমেশ্বর আল্লাহ সবার বড়। তিনি অদ্বিতীয়।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ অধ্যায়-৪, শ্লোক-১৯-এ রয়েছে:

नैनमूर्ध्वं न तिर्यस्चं नमध्ये परिजग्रभत्।
न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः॥

ভাবার্থ : (পরমেশ্বর অনন্ত, তিনি এতই বড় যে) তাঁকে উপর থেকে, এপাশ-ওপাশ থেকে অথবা মধ্য থেকেও কেউ ছুঁতে পারে না। যার নাম অত্যন্ত মহিমাযুক্ত অর্থাৎ যিনি সব

থেকে মহান। এমনকি ওই পরমেশ্বরের কোন উপমাও নেই অর্থাৎ তিনি অতুলনীয়, তাঁর না কোনও অবতার আছে, না কোনও মূর্তি এবং না কোনও প্রতিচ্ছবি।

অনুরূপ সনাতন বৈদিক ধর্মের মুখ্য ধর্মমত হল এই যে, পরমেশ্বর (অর্থাৎ আল্লাহ) অজাত, অবিনাশী, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, অদ্বিতীয় এবং অতুলনীয়। তার না আছে কোনও পুত্র, না কোনও কন্যা, না মা আছে, না বাপ। না ভাই আছে, না বোন এবং না আছে স্ত্রী। ইসলামেরও মুখ্য বিশ্বাস (বা ধর্মমত) এটাই।

'(তিনি) আকাশসমূহ এবং পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তাঁর সন্তান কিরূপে হবে, যেখানে তাঁর স্ত্রীই নেই? এবং তিনি প্রত্যেকটা জিনিসকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতেকটা জিনিসের খবর রাখেন।' (কুরআন, সূরা-৬, আয়াত-১০১)

'এবং ইহুদীরা বলে যে, উজাইর আল্লাহর পুত্র এবং খ্রিস্টানরা বলে যে, মসীহ আল্লাহর পুত্র। এসব তাদের মুখের কথা। ইতিপূর্বে কাফিররা এই ধরনেরই কথা বলত। এরাও তাদের অনুসরণ করতে শুরু করল। আল্লাহ এদেরকে ধ্বংস করুক, এরা কোথায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরছে।' (কুরআন, সূরা-৯, আয়াত-৩০)।

গীতার প্রসিদ্ধ শ্লোক:

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
(গীতা: অধ্যায়-২, শ্লোক-৪৭)

(অর্থাৎ তোমার কর্ম করারই উপর অধিকার রয়েছে মাত্র, (তার) পরিণামের উপর নয়)।

এর ব্যবহারিক রূপ আমি ইসলামের মধ্যে দেখেছি। একজন মুসলমানই মাত্র বাস্তবসম্মতভাবে লাভ-ক্ষতি, জীবন-মরণ, যশ-অপযশ--এসব কিছু আল্লাহর ইচ্ছা মনে করে সহজভাবে মেনে নেয়। তারা প্রতি কথায় বলে। 'ইনশাআল্লাহ' (অর্থাৎ যদি আল্লাহ চায়)।

পাঠকগণ স্বয়ং এটাও অনুভব করতে পারেন যে, যদি একজন মুসলমান পরোপকারের কাজ করে, তাহলেও এটাকে সে মনে করে-- এই কাজ সে করেনি বরং আল্লাহ করিয়েছেন। নিজের কৃতকর্মের জন্য সে না কোনও অহংকার প্রকাশ করে, আর না তার পরিবর্তে কোনও কিছু পাওয়ার বাসনা করে। একমাত্র ইসলামই মানুষকে ব্যবহারিকভাবে নিষ্কাম কর্মযোগী রূপে গড়ে তোলে।

গীতাতে সকাম[১০] (কামনাযুক্ত) কর্ম ও সকাম উপাসনাকে নিম্নস্তরের এবং নিষ্কাম[১১]

১০। সকাম-এর অর্থ হ'ল-- সাংসারিক জীবনের (অর্থাৎ পার্থিব জীবনের) জন্য।

১১। নিষ্কাম-এর অর্থ হল-- সাংসারিক জীবনের জন্য না হয়ে কেবল পরমেশ্বর (অর্থাৎ আল্লাহ)-র জন্য সমর্পণ।

(কামনাহীন) কর্ম ও নিষ্কাম উপাসনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কেবল ইসলামই একমাত্র এমন ধর্ম যেখানে পরমেশ্বরের সকাম উপাসনা আদৌ নেই। সেখানে কেবল নিষ্কাম উপাসনা।

উদাহরণস্বরূপ কুরআন মজিদের প্রারম্ভ সূরা 'ফাতিহা'[১২]-র ঈশ্বর বন্দনার মাধ্যমে হয়েছে। এই ঈশ্বর বন্দনায় নিজের জন্য ভোগবিলাস, আরাম-আয়েশের পার্থিব বস্তুসমূহ, ধন-সম্পদ ইত্যাদির কোনও কামনা নেই। এ হল নিষ্কাম মানসিকতা নিয়ে কৃত পরমেশ্বরের বন্দনা। একজন মুসলমানই মাত্র অনলসভাবে নিরন্তর সর্বাবস্থায় প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত (সময়) অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং নিতান্তই আস্থা সহকারে নিষ্কাম ভাব নিয়ে পরমেশ্বরের উপাসনা করে। পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্কাম ভাব নিয়ে এমনই সমর্পণ অন্য কোথাও নেই। একমাত্র ইসলামই একজন মানুষকে পরমেশ্বরের প্রতি সমর্পণকারী রূপে তৈরী করে। এমনই সমর্পণকারী ভক্তদের জন্য গীতাতে পরমেশ্বরের কাছ থেকে সুসংবাদ রয়েছে:

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगेक्षेमं वहाम्यहम्॥

(अध्याय-९, श्लोक-२२)

ভাবার্থ: 'যে অনন্য প্রেমিক ভক্তজন পরমেশ্বর রূপে আমাকে নিরন্তর স্মরণ করে কামনাহীনভাবে আমার উপাসনা করে। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমার উপাসনাকারী ঐ সব লোকদের যোগ-ক্ষেম (অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর সংরক্ষণ) আমি স্বয়ং পূর্ণ করে থাকি।' (অধ্যায়-৯, শ্লোক-২২)

পরমেশ্বরের আশ্রয়প্রার্থী এ ধরনের আত্মসমর্পণকারী নিষ্কাম উপাসক আধ্যাত্মিক শান্তি এবং মুক্তি লাভ করার অধিকারী। গীতার অধ্যায়-৬, শ্লোক-১৫তে রয়েছে:

शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥

(এমনই আত্মসমর্পণকারী উপাসক) আমার মধ্যে রক্ষিত পরম আনন্দের সর্বোচ্চ শান্তি লাভ করে থাকে।

এভাবেই কুরআন মজিদের সূরা-২, আয়াত ১১২-তে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে:

'হ্যাঁ, যে আল্লাহর সামনে মাথা নত করে দেয় (অর্থাৎ ঈমান আনে) এবং সে সৎকর্মশীল, তাহলে তার প্রতিদান তার প্রভুর নিকট রয়েছে এবং এমন লোকদের (কিয়ামতের দিন) না কোন রকমের ভয় হবে এবং না সে হবে শোকাকুল।'

সূরা-২৪, আয়াত-৪৬-তে রয়েছে:

'আমিই সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ [অর্থাৎ সত্যকে প্রকাশকারী আয়াতসমূহ] নাযিল করেছি (অর্থাৎ অবতীর্ণ করেছি)। আর আল্লাহ যাকে চান, সরল সোজা রাস্তার দিকে হেদায়াত দান করেন।'

১২। 'সূরা ফাতিহা' এই পুস্তকের পৃষ্ঠা নং ৫১ দেখুন।

সনাতন বৈদিক ধর্ম অর্থাৎ বেদ, উপনিষদ এবং গীতা থেকে প্রমাণ হয় যে, দৈহিক, আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব-- এই তিন প্রকার শান্তি লাভ করার এবং মুক্তি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করার সোজা ও সরল রাস্তা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনও পূজ্য নেই' অর্থাৎ ইসলাম।

ইসলাম অনুসারে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থান হবে

এটি একটি যুক্তিপূর্ণ সত্য, কেন না আত্মা নিজের কর্মফল অনুযায়ী প্রাপ্ত জান্নাতের সুখ কিংবা দোযখের (অর্থাৎ নরকের) কষ্ট অনুভব তখনই করতে পারে যখন সে তার শরীর স্বাস্থ্যের অবস্থার পুনঃপ্রাপ্ত হবে। এইরকম হযরত মুহাম্মাদ (স.) যে ইসলাম নিয়ে এসেছেন তা কোনও নতুন ধর্ম নয়। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, ইসলাম যুগোপযোগী সংশোধিত পুনর্জাগরিত সত্য ধর্ম।

উপযুক্ত প্রমাণ অনুযায়ী তৌহীদের (অর্থাৎ একেশ্বরবাদের) ভিত্তিতে ইসলামের সবচেয়ে নিকটবর্তী যদি কোনও ধর্ম থাকে তবে তা সনাতন বৈদিক ধর্ম।

কিন্তু ইসলামে তৌহীদের (অর্থাৎ একেশ্বরবাদের) প্রতি যে প্রত্যয় এবং সমর্পণ তা অন্য কোথাও নেই।

ইসলামে এটারও ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে একেশ্বরবাদের (তৌহীদের) কিংবা কুরআন মজীদের শুদ্ধতা বজায় থাকে, এই ব্যবস্থা অন্য কোথাও নেই।

আমি অনুভব করেছি, ইসলামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীর হৃদয়ে আল্লাহর (অর্থাৎ পরমেশ্বরের) প্রতি যে ভয় বিদ্যমান তা অন্য কারও হৃদয়ে নেই।

এই সমস্ত বিশেষত্বের কারণে ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হ'ল এই যে, একেশ্বরবাদের সত্যতার প্রবক্তা সনাতন বৈদিক ধর্ম আজ গ্রন্থাবলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে গিয়েছে, তার পরিবর্তে বহু ঈশ্বরবাদ (শিরক)-এর সত্যতা স্থান লাভ করেছে। এখানে আজ নতুন নতুন দেবতা ঈশ্বরের নতুন নতুন অবতার তৈরী হয়ে চলেছে। যদি টিভি অথবা সিনেমায় কোনও ব্যক্তিকে ঈশ্বরের অবতার বানিয়ে দেওয়া যায়, মহিমামণ্ডিত করা হয়, তাহলে সেখানে জনগণ তার পূজা শুরু করে দেয়। কেউ কেউ তো নিজেদেরকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং জনগণ তাদের পিছনে পিছনে দৌড়াচ্ছে। দুঃখের কথা হল যে, অসত্যের যতটা বৈভব আমাদের এখানে আছে ততটা অন্য কোথাও নেই। ঈশ্বর সকলকে সুবুদ্ধি দান করুন। এমনই মনে হয় যে, লোকেরা নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেক এ দুটির কোনওটাকে কাজে লাগাচ্ছে না।

একটু ভেবে দেখুন !

হে আমাদের পথভ্রষ্ট জনগণ একটু ভেবে দেখুন, যে পৃথিবীতে আমরা বসবাস করি, তা হ'ল সূর্যের (যা একটি নক্ষত্র) চতুর্দিকে আবর্তনকারী একটি গ্রহ। সূর্যকে আবর্তনকারী এরকম অনেক গ্রহ আছে এবং এই গ্রহগুলিরও পৃথক পৃথক ভাবে আবর্তনকারী অনেক অনেক উপগ্রহ রয়েছে। যেমন আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র, যা পৃথিবীকে আবর্তন করে চলেছে। সূর্যের এই গ্রহগুলির মধ্যে আমাদের পৃথিবীর থেকে ছোট গ্রহও আছে। আবার বৃহস্পতির মতো এতবড় গ্রহও আছে যার মধ্যে কয়েক হাজার পৃথিবী ভরে যাবে। সূর্য এবং সূর্যের এইসব গ্রহ-উপগ্রহ (অর্থৎ সৌর মণ্ডল)-এর মধ্যে আমাদের পৃথিবীর অস্তিত্ব নিতান্তই ক্ষুদ্র।

আমাদের সূর্য হ'ল আমাদের ছায়াপথের (গ্যালাক্সি) এক নক্ষত্র। এই ছায়াপথে প্রায় দু'শো অর্বুদ নক্ষত্র (অর্থাৎ সূর্য) রয়েছে, যার মধ্যে অনেক নক্ষত্র আমাদের সূর্যের থেকে হাজার হাজার গুণ বড় এবং উজ্জ্বল।

ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমাদের ছায়াপথের মতো অর্বুদ অর্বুদ কোটি ছায়াপথ রয়েছে। এর মধ্যে ১০ হাজার কোটিরও বেশি এমন ছায়াপথ রয়েছে যেখানে আমাদের ছায়াপথের থেকে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি নক্ষত্র (সূর্য) রয়েছে। এই নক্ষত্রগুলির মধ্যে দূরত্ব এত বেশি যে মাইল কিংবা কিলোমিটারে পরিমাপ করার পরিবর্তে আলোকবর্ষ দ্বারা পরিমাপ করা হয়। আমাদের পৃথিবী থেকে দূরে অবস্থিত ছায়াপথের এ পর্যন্ত অধিকতম দূরত্ব পরিমাপ করা হয়েছে। তের অর্বুদ বিশ কোটি আলোকবর্ষ।

এই দূরত্ব কতটা একটু আন্দাজ করে দেখুন। আলোকরশ্মি প্রতি সেকেন্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। এই হিসাবে আলোকরশ্মি এক ঘন্টায় ১০৮ কোটি কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। এই গতিবেগ উড়োজাহাজের সর্বোচ্চ গতিবেগ (প্রতি ঘন টায় ১৫০০ কিলোমিটার)-এর সাত লক্ষ কুড়ি হাজার গুণ এবং রকেটের সর্বোচ্চ গতিবেগ (প্রতি ঘন্টায় তিরিশ হাজার কিলোমিটার)-এর ছত্রিশ হাজার গুণ বেশি।

এ রকম তীব্র গতিবেগে আলোকরশ্মি যদি এক বৎসর চলতে থাকে তাহলে নয় লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার আশি কোটি কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করবে। নয় লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার আশি কোটি কিলোমিটারের এই দূরত্বকে এক আলোকবর্ষ দূরত্ব বলা হয়।

আলোকরশ্মি নিজের এই গতিবেগে ক্রমাগত ১৩ অর্বুদ ২০ কোটি বৎসর যাবৎ চলে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করবে সেই দূরত্ব হ'ল ১৩ অর্বুদ ২০ কোটি আলোকবর্ষ। এখনও পর্যন্ত এতটা দূরত্বে অবস্থিত ছায়পথ পরিলক্ষিত হয়েছে।

এই দূরত্ব তো কেবল আমাদের ছায়াপথ এবং অন্য এক অবস্থিত ছায়পথের মধ্যকার, যা পরিমাপ করা গেছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তো সমস্ত দিক দিয়েই এমনভাবে প্রসারিত এবং এই যে

দূরত্ব পরিমাপ করা হয়েছে তা চুড়ান্ত নয়। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা স্বীকার করছে যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতা সম্পর্কে যে জ্ঞান তাদের রয়েছে, প্রকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এরকম হাজার হাজার কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভরে যাবে। সব মিলিয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের হিসাবে আল্লাহ (অর্থাৎ পরমেশ্বর)-এ সৃষ্টি অনন্ত যা মানুষের বুদ্ধি ও হিসাবের বাইরে।

যদি আমরা ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এবং তার জীবজন্তু, গাছপালা ও প্রকৃতির সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনাকে দেখি, তার উপর গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে ঈশ্বরের সীমাহীন এবং অনন্ত শক্তিকে দেখে তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় মন ভরে যায়।

উদাহরণস্বরূপ পৃথিবীকে নিন। জীবনের জন্য ঈশ্বর পৃথিবীকে কতই উপযোগী ও পরিকল্পনামাফিক সৃষ্টি করেছেন। এখানে জীবনের জন্য সমস্ত আবশ্যক পরিবেশ পরিস্থিতিকে প্রকৃতির মাধ্যমে কেমন পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সূর্য থেকে আগত বিষাক্ত অতি বেগুনি রস্মি থেকে জীবনকে রক্ষা করার জন্য আশ্চর্যজনকভাবে ওজোন স্তর বিছিয়ে রাখা আছে। জীবকুলের খাওয়া ও পান করার নানান ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব কিছু এতটাই সুবিন্যস্ত যে, যদি আমরা এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই। এসব কিছু আপনা-আপনি হয়ে যায়নি, বরং অবশ্যই কোনও সত্তা এই ব্যবস্থাপনা তৈরী করেছেন।

বিজ্ঞানের নিয়ম হ'ল বলপ্রয়োগ ছাড়া কোনও কাজ হতে পারে না। এই কাজে যে বল প্রয়োগ করা হ'ল-- তা গতিশক্তি হোক বা স্থিতিশক্তি-- তাতে বল বা শক্তি সঞ্চার করল কে? যদি সূর্য থেকে হয়, তাহলে তা সূর্যের কাছে কোথা থেকে আসল? যদি তার পদার্থের পরমাণুর পারমাণবিক বিক্রিয়া (নিউক্লিয়ার রিয়্যাকশান) থেকে হয়, তাহলে এই বিক্রিয়া কিভাবে শুরু হল? কিংবা এজন্য এইসব পদার্থ কোথা থেকে এসেছে? প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেলেও বিষয়টি সেই জায়গায় এসে যায় যে, যে কোনও শ্রম ও উদ্যোগ ছাড়া বল বা শক্তির এই উৎপন্ন হতে পারে না।

অন্য কথায়, শক্তি থেকে উদ্যোগ এবং উদ্যোগ থেকে শক্তি। এমনিভাবে যদি পদার্থ থেকে উদ্যোগ সৃষ্টি হয় তাহলে ওই পদার্থের অস্তিত্ব উদ্যোগ থেকেই সম্ভব। এটাই প্রকৃতির নিয়ম এবং প্রকৃতি হল বিশুদ্ধ বিজ্ঞান। পরিশেষে এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, বীজ থেকে গাছ হয়েছে, না কি গাছ থেকে বীজ? নাস্তিক ও মিথ্যাপন্থীদের কাছে এর জবাবে কেবল আন্দাজ অনুমানই থাকবে। ব্রহ্মাণ্ডে অথবা পৃথিবীতে জীব কিভাবে এবং কোথা থেকে এসেছে? মানুষসহ পশুপক্ষী, পোকামাকড় সর্বপ্রথম কিভাবে পৃথিবীতে এসেছে? এ সবের আশ্চর্যজনক এবং বিচিত্র সৃষ্টি দেখুন-- চোখ, কানসহ অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি দেখুন এবং এরপর গভীরভাবে চিন্তা করুন। মনে হয় না কি যে, সবকিছুর মতো এগুলিও পরিকল্পনা প্রসূত সৃষ্টি করা হয়েছে? সৃষ্টিকে বৃদ্ধি করার নিমিত্তে কিভাবে সমস্ত জীবকুলের মধ্যে কামবাসনা প্রদান করা হয়েছে। যদি এই বাসনা না থাকত তাহলে জীবজন্তুরা তাদের নিজেদের ক্ষেত্রকে বাড়াতে

পারত না। এমনই বিচিত্র ও আশ্চর্যজনক সৃষ্টি (অর্থাৎ মাখলুকাত)কে বাস্তবায়ন পরমেশ্বর ছাড়া আর কেউ করতে পারে না।

এ তো এই অনন্ত অসীম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি কণার পদমর্যাদা প্রাপ্ত পৃথিবীর অবস্থা। এখন ভেবে দেখুন! কেমন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে উপগ্রহ গ্রহকে, গ্রহ নক্ষত্রকে, নক্ষত্র ছায়াপথকে এবং ছায়াপথ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আবির্তত হচ্ছে। যদি তাদের মধ্যে এই গতি না প্রদান করা হত তাহলে তাদের অস্তিত্বই থাকত না।

তাহলে এই গতি প্রদানকারী কে? কিছু নাস্তিক ও অজ্ঞজনেরা বলবেন যে, মহাবিশ্বে এক মহা বিস্ফোরণের মাধ্যমে এদের মধ্যে গতি সঞ্চার করা হয়েছে, তাহলে আমাদের প্রশ্ন , এই বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিস্থিতি কে সৃষ্টি করল? তারপর ওই প্রশ্নের পর প্রশ্ন-- যার চুড়ান্ত জবাব দেওয়া মানবীয় বুদ্ধির সীমার অনেক বাইরে।

বর্তমানে মানুষের তৈরী উপগ্রহ (স্যাটেলাইট)কে পৃথিবীর কক্ষে এমনভাবে স্থাপিত করা হয় যে তা আপনাআপনি আবর্তন করতে থাকবে। হিসাব করা হয় যে, তাকে রকেটের মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টায় কত কিলোমিটার গতিবেগে ছোড়া হবে। এখন প্রশ্ন হ'ল, মহা বিস্ফোরণের ফলে অসংখ্য নক্ষত্র সৃষ্টি হওয়ার জন্য যে পদার্থগুলি বিক্ষিপ্ত হয়েছিল সেই সবগুলির জন্য পৃথক পৃথক এই হিসাব কি করে করা হয়েছিল কিংবা কে করেছিল, যাতে অসংখ্য নক্ষত্রগুলির এই উপাদান (যা থেকে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার ব্যাস বিশিষ্ট অসংখ্য বিশাল বিশাল নক্ষত্রমালা তৈরী হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে) পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ কক্ষপথে স্থাপিত হয়ে নিজেদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করতে শুরু করে দিল? এসব কি আপনাআপনি হওয়া সম্ভব হতে পারে? মানুষের বিবেক এবং যুক্তিতর্ক এর উত্তরে 'না' বলবে।

ঐশীগ্রন্থ কুরআনে এসবকে বারংবার সর্বশক্তিমান আল্লাহ (অর্থাৎ পরমেশ্বর) দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যিনি অনাদি ও অনন্ত অসীম।

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক অসীম জটিল রহস্য যার সৃষ্টি নিজে নিজেই হয়ে যায়নি, বরং নিজের থেকে কিছু হয় না। হওয়ার পিছনে কারণ থাকে এবং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হওয়ার কারণ ঐ এক পরমেশ্বর (অর্থাৎ আল্লাহ) ব্যতীত আর কেউ নয়। সমস্ত প্রশ্নের এটিই একমাত্র সন্তোষজনক জবাব।

এসব কিছুকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হল এই যে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, তার পরিচালনাকারী এবং তাকে বিনাশ (অর্থাৎ কিয়ামত)কারী একমাত্র ঈশ্বর। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, উপার্জন-ভক্ষণ করে, অসুস্থ হয়ে, বৃদ্ধ হয়ে নিছক মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি মাত্র এ সত্ত্বা হতে পারে না, এইরকম জীবনের মর্যাদা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায় শূন্য বরাবর।

যুক্তি বলে, এরকম ঈশ্বর খাওয়া, পান করার প্রয়োজনের উর্দ্ধে হবেন, লিঙ্গ

পরিচয়ের উর্দ্ধে হবেন, কাম-বাসনার উর্দ্ধে থাকবেন। কেননা তিনি স্বয়ং সেই আনন্দের উৎস যে আনন্দ, কাম-বাসনা মানুষ প্রাপ্ত হয়। তিনি নিরাকার, তাঁর না আছে কোনও মা, না আছে কোনও বাপ। না কোনও বোন, আর না কোনও ভাই, না আছে স্ত্রী, আর না আছে কোনও পুত্র কন্যা। তাঁর জন্ম হয় না, আর না তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এবং তিনি আল্লাহ (অর্থাৎ পরমেশ্বর) ছাড়া আর কেউ নন।

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকারী আল্লাহ (অর্থাৎ পরমেশ্বর) জন্মহীন, অবিনাশী, সর্বশক্তিমান এবং অনন্ত, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

পূর্ণমদ: পূর্ণমিদং পূর্ণাত্পুর্ণমুদচ্যতে।

ভাবার্থ: 'তিনি (পরমেশ্বর) পূর্ণ এবং (তাঁর) এই (সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড)ও পূর্ণ কেননা পূর্ণ থেকেই পূর্ণের উৎপত্তি হয়। (এখানে পূর্ণের অর্থ অনন্ত। এখনি আমি উপরে ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ততা প্রমাণ করেছি এবং অনন্তই একমাত্র এমন পূর্ণতা যা অনন্তকে সৃষ্টি করতে পারে)।

এর ভাবার্থ হ'ল, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর অনন্ত অসীম এবং তাঁর সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডও অনন্ত, কেননা অসীম থেকেই অসীমের উৎপত্তি হয়।

ইসলাম সত্যের আওয়াজ 'আল্লাহু আকবর' (অর্থাৎ আল্লাহ সবচেয়ে বড়) এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কেউ পূজ্য নয়)-এর স্বরূপে এই মহান সত্যের বার্তা দুনিয়াতে পেশ করেছে।

এ থেকে এই সারাংশ বের হয় যে, ইসলামের সত্যতা এই পৃথিবীতে সার্বিকভাবে অনন্তকাল ধরে বিদ্যমান। অন্য কথায় ইসলাম হ'ল-- অনাদি এবং অনন্ত।

পুস্তকের সমস্ত সারাংশ দেখার পর চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম সন্ত্রাস নয়, আদর্শ। ইসলামের এই আদর্শ অনস্বীকার্য।

আমাদের সকলের কর্তব্য

এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, ইসলাম কেবল মুসলমানদের জন্য নয়, বরং সম্পূর্ণ মানবতার জন্য, মানবতার কল্যাণের জন্য।

এটা জ্ঞাত যে, ইসলামের বদনাম করার জন্য, সন্ত্রাসবাদকে মুসলমানদের সঙ্গে যুক্ত করার বড় ধরনের পরিকল্পিত চক্রান্ত করা হচ্ছে। মোবাইল থেকে এসএমএস পাঠিয়ে প্রচার করা হচ্ছে, 'সব মুসলমান সন্ত্রাসবাদী নয়, কিন্তু প্রত্যেক সন্ত্রাসবাদী মুসলমান।'

মুসলমানরাই যদি সন্ত্রাসবাদী হত তাহলে সন্ত্রাসবাদী হামলা মুসলমানদের উপর হত না। হায়দ্রাবাদের মক্কা মসজিদ এবং মালেগাঁও (মহারাষ্ট্র)-এর ঈদগাহে এই হামলা হত না।

মুসলিম মাদ্রাসাগুলি এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনগুলি এবং মুসলিম আলিমদের সম্পর্কে অপপ্রচার করা হয়েছে যে, তারা সন্ত্রাসবাদের প্রেরণা যোগায়। এর সত্যতা যাচাই করার জন্য আমি প্রায় সমস্ত প্রধান সামাজিক ও ধর্মীয় মুসলিম সংগঠনগুলির সমীক্ষা করেছি, কিন্তু সেখানে কোনও সন্ত্রাসবাদের সমর্থককে আমি পাইনি। বলা হয় যে, মাদ্রাসাগুলিতে সন্ত্রাসবাদীদের তৈরী করা হয়। মাদ্রাসাগুলির তৈরী করা সন্ত্রাসবাদীদের খুঁজতে আমি লখনৌয়ে অবস্থিত মাদ্রাসা নাদওয়া কলেজসহ অন্যান্য কয়েকটি মাদ্রাসাতে গিয়েছি কিন্তু সেখানে সন্ত্রাসবাদের পরিবর্তে আমি শান্তি, অনুশাসন, সভ্যতা, বড়দের প্রতি সম্মান ও মানবতার প্রতি প্রেম দেখতে পেয়েছি। কিছু লোক মনে করে যে, মাওলানারা সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা দেন। এর সত্যতা জানার জন্য আমি বহু আলেম ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তাঁদের মতামত জানার পর কোনও দৃষ্টিকোণ থেকে আমার মনে হয়নি যে, এইসব ইসলামী বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ সন্ত্রাসবাদের সমর্থক হতে পারেন। কেননা, তাঁরা তো মানবতার ইসলামের কথা ব্যক্ত করে থাকেন। এই পুস্তক লেখার পূর্বেই বহু বিদ্বান মাওলানাদের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম। হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নাদবী (রহ.) (আলি মিয়াঁ) কর্তৃক স্থাপিত পায়ামে ইনসানিয়াত ফোরাম দেশের বিভিন্ন অংশে সেমিনার আয়োজিত করেছিলেন, যেগুলিতে মানবতার প্রতি মতামত ব্যক্ত করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল।

এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন এবং সংস্থাগুলিও আমাকে তাদের সার্বজনিক প্রোগ্রামগুলিতে বলার জন্য সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এইসব সুযোগ আসায় বহু মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। এইসব বিদ্বান মাওলানাদের সরলতা, সজ্জনতা এবং মানবতার জন্য তাঁদের হৃদয়ের স্পন্দন আমাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। মুসলিম সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনগুলি এবং মুসলিম বিদ্বান (মাওলানা) ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, জনগণের মধ্যে জ্ঞাতসারে ইসলামের বদনাম করার চক্রান্ত চালানো হচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে মুসলমানদের মতামত জানার জন্য আমি কয়েক হাজার মুসলমানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছি। এদের মধ্যে সমস্ত মুসলমানদের নিজেদের

অমুসলিম প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব কিংবা মিত্রতার সম্বন্ধ আমি দেখেছি। তাদের মধ্যে কোনও মুসলমান চায় না যে, নির্দোষ মানুষদের কেউ হত্যা করুক। অমুসলিম (যে মুসলমানদের কোনও ক্ষতি করেনি)-এর প্রতি ঘৃণা পোষণকারী, সন্ত্রাসবাদের সমর্থক একজনও মুসলমানকে আমি পাইনি।

এরপরও যদি কেউ এমনটা হয় তাহলে তার জন্য সমস্ত মুসলমানদেরকে কিংবা ইসলামকে যেকোনওভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে না। এটা অপবাদ, আর অপবাদ সব জায়গায় হয়ে থাকে।

সন্ত্রাসবাদের মন্দ পরিণাম মুসলমান এবং অমুসলমান উভয়েই ভোগ করছে। কেননা, সন্ত্রাসবাদের শিকার উভয়েই হচ্ছে, অথচ সন্দেহের চোখে কেবল মুসলমানদেরকেই দেখা হচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদ সন্ত্রাসবাদই। তাকে কোনও ধর্ম অথবা সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করা অন্যায়।

মুসলমানরা জানে যে, প্রত্যেক সন্ত্রাসবাদী হামলায় সেইসব মানুষদের শক্তি সঞ্চয় হয় যারা ইসলামের বদনাম করতে চায়। কেননা, এইসব হামলার পর অমুসলিমরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে লোকতন্ত্র অর্থাৎ গণতন্ত্রে এক সম্মিলিত শক্তির রূপ নেয়। আর এই শক্তির ফায়দা ইসলাম বিরোধীরা অর্জন করে।

এ ধরনের প্রত্যেক হামলার পর এই শক্তি বেড়েই যেতে থাকে। সেই ক্ষেত্রে এই শক্তি অত্যন্ত মজবুত রাজনৈতিক শক্তিতে রূপ নেয় যেখানে সন্ত্রাসবাদী হামলা বড় ধরনের হয় কিংবা বেশি সংখ্যায় হয়। এইজন্য ইসলামের বদনামকারী শক্তিগুলো চায় যে, এ ধরনের হামলা সবসময় হতে থাকুক। যাতে বসে বসে অনায়াসে শক্তি অর্জন করা সম্ভব হয়। এই পরিস্থিতিতে আমাদের সকলের কর্তব্য হল, এ ধরনের মানুষদের এই উদ্দেশ্য সফল হতে না দেওয়া এবং দেশকে অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা করা।

সমর্পণ

আমি এই পুস্তকের প্রারম্ভে লিখেছি যে, প্রকৃত ইসলামকে জানার পর আমি নিজের ভুলকে অনুভব করেছি-- আমি ইসলামকে নিয়ে পূর্বে যা লিখেছিলাম বা বলেছিলাম তা ছিল অসত্য এবং অনুচিত।

নিকট থেকে ইসলামকে না জানা বিভ্রান্ত লোকদের মনে হয় যে, মুসলিম আলেমরা অমুসলিমদের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী অত্যন্ত কঠোর মানুষ হয়ে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে যেমনটা আমি দেখেছি, জেনেছি এবং তাদের সম্পর্কে শুনেছি, তাতে এই সত্যতা আমার সামনে এসেছে যে, 'মাওলানা' যাঁদের বলা হয় তাঁরা ব্যবহারিক জীবনে সদাচারী হয়ে থাকেন। অন্য ধর্মের ধর্মাবলম্বীদের প্রতি নিজেদের হৃদয়ে সম্মান পোষণ করেন। সেইসঙ্গে মানবতার প্রতি দয়ালু এবং সংবেদনশীল হন তাঁরা। একজন সাধু ব্যক্তির সমস্ত গুণাবলী আমি তাঁদের মধ্যে দেখেছি। ইসলামের এইসব পণ্ডিতগণ সম্মানের যোগ্য, যাঁরা ইসলামের সিদ্ধান্ত ও নিয়মাবলীকে কঠোরভাবে পালন করেন, গুণের সমাদর করেন। তাঁরা অত্যন্ত সভ্য এবং মৃদুভাষী হয়ে থাকেন।

মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ভ্রমবশত: আমিও এরকম ভুল ধারণা পোষণ করে রেখেছিলাম। এর প্রভাব আমার প্রথম পুস্তক 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস'-এও পড়েছিল। নিজের এই ভুলগুলির প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আমি সকলের কাছে সার্বিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকতাম। কিন্তু সমস্যা ছিল যে, আমার লেখা পুস্তক (ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস) এবং আমার বক্তব্যের ক্যাসেট সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলত: ক্ষমা (অর্থাৎ তওবা) আমি এইভাবে চাইতে থাকব যাতে গোটা দেশ জানতে পারে। তবেই আমার লেখা ও কথিত বক্তব্যের খণ্ডন ওই সমস্ত লোকদের কাছে পৌঁছাতে পারবে যারা ওইগুলি পড়েছে বা শুনেছে। এজন্য প্রভাবশালী হিন্দু এবং মুসলমান ভাইদের সহযোগিতা আবশ্যক। এমন মানুষদের সহযোগিতা অর্জন করার জন্য দেশের বিভিন্ন শহরে গিয়ে আমি মানুষজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগলাম (যাঁদের বিচার বিবেচনা এ রকমই ছিল)।

লোকেরা সঙ্গ দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে পরের দিন কিংবা পরবর্তীতে ডাকত কিন্তু দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ করলে পর সে নিজের আশ্বাস থেকে পাল্টে যেত। এইভাবে আমি ক্রমাগত ৬ মাস পর্যন্ত গোটা দেশ জুড়ে দৌড়ঝাঁপ করতে থাকলাম। এ ভাবেই আমার এমন বহু সময় বরবাদ হয়েছে, কিন্তু সফলতা পাওয়া যায়নি। লাভ খুবই সীমিত হওয়া এবং এত দৌড়ঝাঁপ করার পরও সফলতা না পাওয়ার কারণে আমি ভেঙ্গে পড়তে লাগলাম।

এক রাতে অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার ঘুম আসল না এই ভেবে যে, মনে হয় আমি যা করতে চাই সেটা পরমেশ্বর অর্থাৎ আল্লাহ চান না, তাই আমার এই প্রয়াস ছেড়ে দেওয়া উচিত। এইরকম ভাবতে ভাবতে আমার ঘুম এসে গেল। নিদ্রার মধ্যে আমি এক

অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'ওঠো, হতাশ হয়ো না। আল্লাহ তোমার তওবা কবুল করেছেন। যেমনভাবে ওটা লিখেছিলে, তেমন ভাবে এটা লিখে ফেলো, সামনে সাফল্যই সাফল্য।'

এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জেগে ওঠার পর আমার মধ্যে এক তীব্র অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হল। অন্তর তীব্রভাবে ধড়ফড় করছিল। পাঁচ-সাত মিনিট ওই অবস্থায় বসে থাকার পর আমি উঠে জল পান করলাম। ঘড়িতে দেখলাম রাত্রি তিনটে বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে (কত মিনিট তা আমার স্মরণে নেই)। পুনরায় বসে আমি স্বপ্ন সম্পর্কে ভাবতে লাগলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম না 'যেমন ওটা লিখেছিলে তেমনভাবেই এটাও লিখে ফেলো'-- এই কথার অর্থ কি? কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনা করার পর আমার মনে হল-- এর অর্থ এরকম হতে পারে যে, 'যেমনভাবে ওই (পুস্তক অর্থাৎ ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস) লিখেছিলে তেমনই এটাও (অর্থাৎ যা সত্য) তা লিখে ফেল।'

এটাকে ঐশী আদেশ (অর্থাৎ অদৃশ্য থেকে আগত আদেশ) বলে মেনে নিয়ে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম যে, এখন আমি এই বিষয়ে কারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাব না। বড় পরিবর্তন এই হল যে, পূর্বে আমার ভুলভ্রান্তিগুলোর জন্য কেবল তওবা করাই উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ নিজের লেখা ও কথিত বক্তব্যগুলিকে সার্বজনিকভাবে খণ্ডন পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করে তওবা করে চুপচাপ বসে যাওয়া। তখন এই পুস্তক (ইসলাম: সন্ত্রাস নয় আদর্শ) লেখার সিদ্ধান্ত আমার হৃদয়ে আদৌ ছিল না। কিন্তু এই আদেশ আসার পর এখন আমার উদ্দেশ্য পাল্টে গেল। এখন আমি ইসলামের সত্যতার উপর এই পুস্তক লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে প্রকৃত ইসলামকে পরিচিত করানো এবং এই দেশে উৎপীড়িত মানুষের সঙ্গে বিভেদ সৃষ্টির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার জন্য এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৃষ্ট দূরত্বকে শেষ করার জন্য 'ভারতীয় জনসেবা ফ্রন্ট' ও 'হিন্দু-মুসলিম জন-একতা মঞ্চ' নামক সংগঠন তৈরী করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন এই কাজে সাহায্য করার জন্য মানুষদের প্রেরণা দান করেন।

এরপর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমি পুস্তক লেখার সংকল্প করলাম। কিন্তু যে পুস্তক আমি প্রথমে লিখেছিলাম, এখনকার পুস্তকের বিষয় ছিল তার বিপরীত, যে বিষয়ে আমি না কখনো ভেবেছি, আর না এ বিষয়ে বেশি আমার কোনও অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান ছিল। তা সত্ত্বেও কোনও অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে আমি এই পুস্তক লেখা শুরু কররাম।

পুস্তক লেখার সময় যে ধরনের একাগ্রতার সৃষ্টি হ'ল এবং যে রকম সহজসাধ্যভাবে আমি এই পুস্তক লিখলাম তাতে আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, আল্লাহর (অর্থাৎ পরমেশ্বর) প্রচ্ছন্ন সাহায্যেই আমি এই পুস্তক লিখতে পেরেছি।

যখন আমি এই পুস্তক লেখা শুরু করি তখন প্রারম্ভেই ২৪ আয়াত বিশিষ্ট যে পুস্তিকার বিষয়ে লিখেছি, সে সময় ওই পুস্তিকা (প্যামফ্লেট) আমার কাছে ছিল না, যদিও আমার জানা

ছিল যে, এমন পুস্তিকা বন্টন করা হয়েছে। ওই ২৪টি আয়াতগুলির মধ্যে কিছু আয়াত ছাড়া অবশিষ্ট আয়াতগুলি আমার স্মরণে ছিল না। ওই সময় প্যামফ্লেটের অপ্রাচুর্যতা আমার কাছে খুব ভারী বোধ হতে লাগল। আমি ভাবছিলাম-- কোথা থেকে এই পুস্তিকা যোগাড় করব? কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ওইদিন সন্ধ্যায় দিল্লি থেকে উক্ত পুস্তিকার প্রকাশক হিন্দু রাইটার্স ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ডা. কে বি পালিওয়ালের কাছ থেকে ডাকযোগে পাঠানো একটা খাম আসল। যার মধ্যে ২৪ আয়াত বিশিষ্ট পুস্তিকা আমি পেয়েছিলাম। ডাকযোগে প্রাপ্ত ওই খাম এবং তার মধ্যে পাঠানো পুস্তিকাসহ অন্য মুদ্রিত সামগ্রী আমার আছে এখনও সুরক্ষিত রয়েছে। এরপরের দিনই দিল্লি থেকে প্রকাশিত হিন্দু মহাসভার পাক্ষিক পত্রিকা 'হিন্দু সভা বার্তা'ও আমি পেলাম, যার মধ্যে এই বিষয় আরও বিস্তারিতভাবে ছাপা হয়েছিল। এইভাবে পুনরায় পুস্তিকা পাবার ফলেই আমি পুস্তকের ওই অংশ লিখতে পেরেছি যেখানে ২৪ আয়াতের উল্লেখ রয়েছে।

মানবতার কল্যাণে সত্য এবং ন্যায়ের এই কাজে সফলতার জন্য আমি পরমেশ্বরেরই (অর্থাৎ আল্লাহর) সাহায্য চাই। তিনি করুণাময় ও দয়ালু। আমাকে সাহায্য করুন, আমাকে পথ প্রদর্শন করুন।

এই পুস্তক 'ইসলাম: সন্ত্রাস নয় আদর্শ' সেই কৃপাময় এবং দয়ালু আল্লাহর (অর্থাৎ পরমেশ্বর) কাছেই সমর্পিত, যাঁর কৃপায় এই পুস্তক লেখা সম্ভব রয়েছে।

পাঠকদের কাছে নিবেদন

এই পুস্তকটি বিশেষ করে ওইসব মানুষদের জন্য লেখা হয়েছে যাঁরা সঠিকভাবে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞাত নন, যাতে তাঁরা আতংকবাদ (সন্ত্রাসবাদ) সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ সঠিকভাবে বুঝতে পারেন। আমাদের মুসলিম ভাইদের কর্তব্য হ'ল এই যে, তাঁরা নিজেদের (আর্থিকভাবে) সামর্থ্য অনুযায়ী এই পুস্তককে বেশি বেশি সংখ্যায় অমুসলমিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের কাছে উপহারস্বরূপ পড়ার জন্য প্রেরণ করবেন। আমি অন্য ভাষায়ও এই পুস্তকের সংকলন প্রকাশিত করাতে চাই। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে তাহলে এই কাজও সম্পন্ন হবে। সত্যের এই সুসংবাদ আমি প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। এজন্য পাঠকদের কাছে আমার নিবেদন, তাঁরা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে এই কাজকে ত্বরান্বিত করবেন।

সমাজ-কল্যাণের এই কাজে এবং পরবর্তী কাজেও সত্যের প্রতি সমর্পিত জনগণের সার্বিক সহযোগিতা আবশ্যক।

নিবেদক

স্বামী লক্ষ্মী শংকরাচার্য

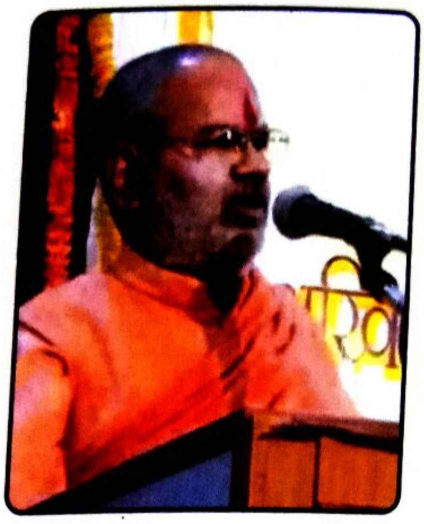

লেখক পরিচিতি

উত্তর প্রদেশের কানপুর জেলার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামী লক্ষ্মী শংকরাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্বামী সীতারাম ত্রিপাঠী এবং মাতা শ্রীমতী কৌশিল্যা দেবী উভয়েই অধ্যাপক ছিলেন। স্বামীজী কানপুর এবং এলাহাবাদ থেকে শিক্ষার্জন করেন। শিক্ষার্জনের পর তিনি ঠিকাদারীর পেশায় নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরই তিনি পার্থিব চিন্তাভাবনা ত্যাগ করে আধ্যাত্মিকতার দিকে আত্মনিয়োগ করেন।

ইতিমধ্যে ইসলাম প্রসঙ্গে প্রচারিত অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে স্বামীজী 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস' শিরোনামে একটি পুস্তক লেখেন। যার ইংরেজি অনুবাদ 'The History of Islamic Terrorism' শীর্ষক শিরোনামে একটি বই মুম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সত্য সম্পর্কে জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার পর নিজের রচিত প্রথম পুস্তকের জন্য অনুতপ্ত হন এবং 'ইসলাম: আতঙ্ক ইয়া আদর্শ' (হিন্দি) বইটি লেখেন।

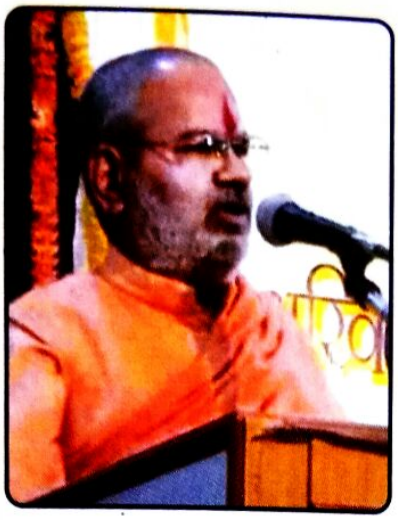

লেখক পরিচিতি

উত্তর প্রদেশের কানপুর জেলার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে স্বামী লক্ষ্মী শংকরাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্বামী সীতারাম ত্রিপাঠী এবং মাতা শ্রীমতী কৌশিল্যা দেবী উভয়েই অধ্যাপক ছিলেন। স্বামীজী কানপুর এবং এলাহাবাদ থেকে শিক্ষার্জন করেন। শিক্ষার্জনের পর তিনি ঠিকাদারীর পেশায় নিযুক্ত হন। কিন্তু কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরই তিনি পার্থিব চিন্তাভাবনা ত্যাগ করে আধ্যাত্মিকতার দিকে আত্মনিয়োগ করেন।

ইতিমধ্যে ইসলাম প্রসঙ্গে প্রচারিত অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে স্বামীজী 'ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস' শিরোনামে একটি পুস্তক লেখেন। যার ইংরেজি অনুবাদ 'The History of Islamic Terrorism' শীর্ষক শিরোনামে একটি বই মুম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সত্য সম্পর্কে জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার পর নিজের রচিত প্রথম পুস্তকের জন্য অনুতপ্ত হন এবং 'ইসলাম: আতঙ্ক ইয়া আদর্শ' (হিন্দি) বইটি লেখেন।